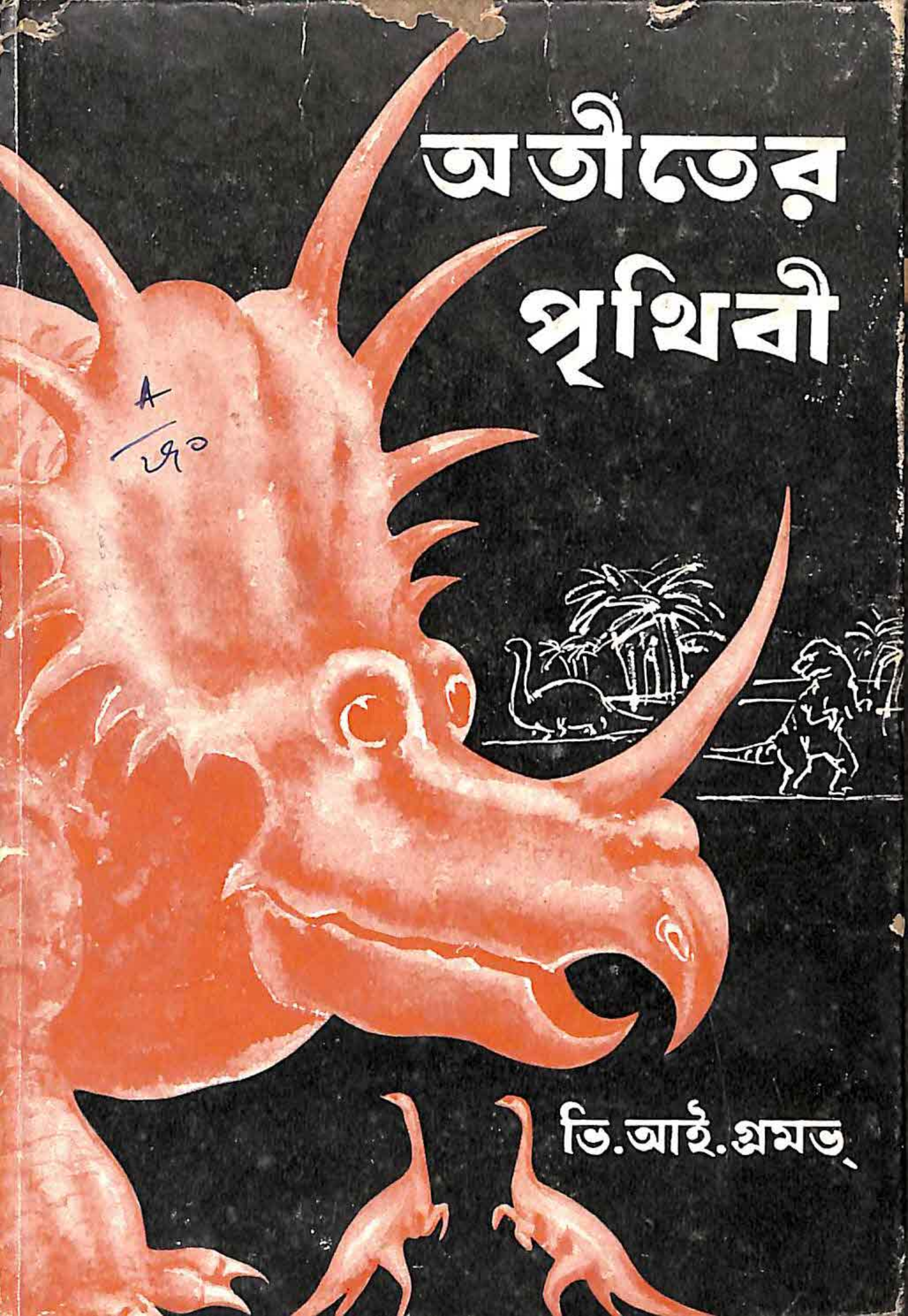


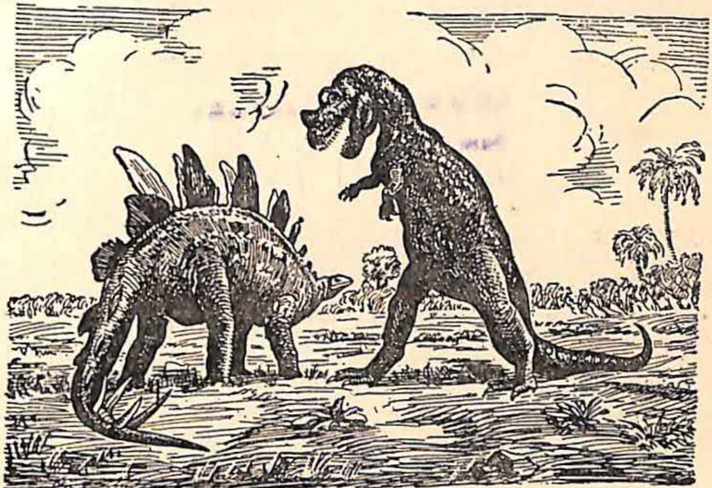
অতীতের পৃথিবী

ভি.আই.গ্রমভ্

অতীতের পৃথিবী

ভি. আই. গ্রমভ্

অতীতের পৃথিবী



রুশ থেকে অনুবাদ :

বিনয় মজুমদার

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি (প্রাইভেট) লিমিটেড
কলিকাতা-১২

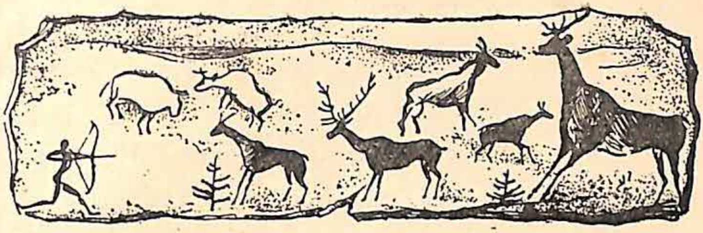
॥ জানুয়ারী ১৯৫৮ ॥

প্রকাশ করেছেন ঃ
সুরেন দত্ত
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি (প্রাইভেট) লিঃ
১২ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট
কলকাতা-১২

ছেপেছেন ঃ
শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল বিশ্বাস
ইণ্ডিয়ান ফোটো এনগ্রেভিং কোং (প্রাইভেট) লিঃ
২৮ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদপট ঃ
খালেদ চৌধুরী

দাম ঃ এক টাকা দশ আনা



বইয়ের বিষয়বস্তু

পৃথিবী এখন যেমন, সবসময় কি তেমন ছিল? বনে বনে আজকাল যেমন গাছ জন্মায় সব সময় কি তেমন গাছই জন্মাত, ঘুরে বেড়াত আজকালকার মত সব জন্তু-জানোয়ার? জলবায়ুও সব সময় আজকালকার মতই ছিল? এই ধরনের লোকই কি আগে বাস করত?

যদি বুড়ো লোকদের এবিষয়ে কিছু জিজ্ঞেস করা হয়, তবে তাদের কেউ কেউ হয়ত বলবেন যে আগে নদী ছিল গাঁয়ের আরো কাছে বা দূরে, বন ছিল আরো বড়, বুনো জানোয়ার ছিল বেশি, নদীতে মাছ ছিল প্রচুর, এখন গেছে কমে। কিন্তু জন্তু-জানোয়ার, মাছ, গাছ ইত্যাদি তখন যে ধরনের ছিল এখনও সেই ধরনেরই আছে।

কিন্তু সবচেয়ে বেশি বয়সের দাদুও বলবেন না যে তিনি, তার বাবা, এমন কি তার ঠাকুর্দার বাবা সেই সময়ে বেঁচে ছিলেন, যখন মস্কোর জায়গায় ছিল একটা সাগর, যার উপকূলে ছিল অজানা সব গাছপালা, বনে ছিল নানারকম দৈত্যদানব।

আর জলবায়ু ছিল এখন সবচেয়ে গরমের দেশগুলিতে যেমন, ঠিক তেমনি। আমাদের দেশে জায়গায় জায়গায় যে-সব ম্যামথ্ এবং গণ্ডারের কঙ্কাল পাওয়া যায়, সেগুলিকে আমার ঠাকুর্দা বা ঠাকুর্দার বাবা শিকার করতেন—এমন গল্প কেউই করবেন না। সবচেয়ে পুরানো পুঁথিতেও আমরা এসব গল্প খুজে পাব না। কিন্তু এগুলি এককালে তো সত্যিই ছিল।

প্রাচীনতম কাল থেকে পৃথিবীতে সংঘটিত নিরবচ্ছিন্ন পরিবর্তনের বিষয়, কী করে ক্রমে ক্রমে পৃথিবীর দূর অতীতের রহস্য উদ্ঘাটিত হল বা কী করে পৃথিবী সম্বন্ধে ধর্ম আর পুরাণের কল্প-কাহিনী ছড়িয়ে গেল সেই বিষয়ে বলা হবে বইটিতে। যা কোনো মানুষ দেখেনি তা কী করে জানা গেছে—পৃথিবীর বয়েস কী করে হিসেব করা হয়েছে, কখন মানুষ এবং বর্তমান-কালের পশুপাখি দেখা দিয়েছে, এদের আবির্ভাবের আগে পৃথিবীর চেহারা কী রকম ছিল, এসব বিষয়ও বইটিতে বলা হয়েছে। কেন মানুষের এসব জানা দরকার তাও এখানে বলা হয়েছে।

পৃথিবীর অতীত কী করে জানা যায়

কোথায় পশুপাখি খুঁজতে হবে শিকারী তা কী করে জানতে পারে? মাটির উপরে প্রাণীরা যে পায়ের ছাপ রেখে যায় সেগুলিই শিকারীকে পথ বাতলে দেয়। পায়ের ছাপ দেখে একজন অভিজ্ঞ শিকারী প্রাণীটির আকার বা বয়সেও বলে দিতে পারে।

কখনো কখনো প্রাণীদের ফেলে যাওয়া চিহ্ন বুঝতে কষ্ট হয়, যেমন ভাঙা ডাল বা খাওয়া ঘাস। এসব দেখে আনাড়ি একজন লোক কিছু বুঝতে পারে না। প্রায়ই লোকে এসব লক্ষ্যই করে না, আবার লক্ষ্য যদি বা করে তো খরগোশের চিহ্নকে কুকুরের, বা হরিণের পায়ের ছাপকে গরুর পায়ের ছাপ বলে ভুল করে।

যে সব জন্তুজানোয়ার কোটি কোটি বছর আগে, পৃথিবীতে মানুষ আসার ঢের আগে বেঁচে ছিল তাদের পায়ের ছাপ, হাড় বা এমন কি আস্ত আস্ত সব কঙ্কাল এখন পর্যন্ত মাটির তলায় রয়ে গেছে।

প্রাণী এবং গাছপালার যেসব অবশেষ পৃথিবীতে পাওয়া যায়, তাদের বলা হয় জীবাশ্ম অর্থাৎ মৃত প্রাণী বা উদ্ভিদ। আর যেসব বৈজ্ঞানিক এগুলির অধ্যয়ন এবং অনুসন্ধান করেন তারা শিকারীই, তবে 'জীবাশ্ম শিকারী'।

প্রাণী এবং উদ্ভিদের জীবাশ্ম বিষয়ক বিজ্ঞানের নাম 'জীবাশ্মবিজ্ঞান।'

জীবাশ্ম দেখে কেমন সব সুন্দর সুন্দর ছবি একজন অভিজ্ঞ শিকারী আঁকতে পারেন! সবচেয়ে মজাদার গল্পগুলিকেও তার গল্পের কাছে একেবারে যাচ্ছেতাই বলে মনে হবে।

কিন্তু কেবল সজীব পদার্থই যে তার ছাপ রেখে যায় তা নয়। ভূত্বকের মধ্যবর্তী বালি ও কাদা, নুড়ি ও পাথর, চূণা-পাথর ও মর্মর, গ্র্যানাইট ও ব্যাসাল্ট—এই সব ছাপ কেবল

বর্তমানকালের নয়, হাজার হাজার, এমন কি কোটি কোটি বছর আগেকার পৃথিবীর সব নদী, হ্রদ, সাগর, বায়ু, আগ্নেয়-গিরি প্রভৃতি সে ছাপ রেখে গেছে। পৃথিবীর কোটি কোটি বছরের জীবনে যে সব প্রক্রিয়া ঘটেছে এবং যাদের থেকে পৃথিবীর খোলস তৈরি হয়েছে, সবচেয়ে উঁচু পর্বতমালা বা নিম্নভূমিগুলি তাদের কথাই বলে।

পৃথিবীতে যা কিছু ঘটে বা কোনোকালে ঘটেছে সেগুলির ছাপ থেকে যায়।

অবশ্য, সব ছাপ এখন অবধি রয়ে যায়নি। কিন্তু রক্ষিত ছাপগুলি দেখে, বই পড়ে জানার মতই পৃথিবীর ইতিহাসও জানা যায় একটার পর একটা ভূমিস্তর অধ্যয়ন করে।

পৃথিবীর ইতিহাসের বিরাট বইখানাকে পড়তে হলে ভূস্তরবর্তী এই সব ঐতিহাসিক চিহ্নগুলিকে যোগাড় করা দরকার, অধ্যয়ন করা দরকার। বইখানার সব পৃষ্ঠা আর আস্ত নেই। কখনো কখনো আমরা ছেঁড়াখোড়া সব পাতা পাই, নয়ত পাই কেবল দু' একটা ছাড়া ছাড়া অক্ষর। পৃথিবীর ঐতিহাসিক দলিলপত্রের মহামূল্য টুকরোগুলোকে একত্র করা এবং পড়ার জন্যে বহু শ্রম, শক্তি এবং সময়, আগ্রহ এবং অধ্যবসায় দরকার।

ভূতত্বে আমাদের মাতৃভূমির বৈজ্ঞানিকদের প্রচুর অবদান আছে। সারা পৃথিবীই রুশ বৈজ্ঞানিক ভ. ও. কোভাল্‌য়েভস্কি এবং আ. প. কার্পিন্‌স্কি-র নাম জানে। এঁরা দুজন রুশ জীবাশ্মবিজ্ঞান এবং ভূতত্ত্বের ভিত্তিস্থাপন করেছেন। সবাই

জানে ভ. ভ. দোকুচেভ্-এর নাম যিনি মৃত্তিকাবিজ্ঞানের জন্মদাতা, জানে আকাদেমী-সভ্য আ. আ. বোরিসিয়াক্, আ. দ. আর্খাঙ্গেল্‌স্কি, আ. প. পাভ্‌লভ্-এর নাম, আশ্চর্যপ্রতিভাদীপ্ত সুশিক্ষিত ই. দ. চেস্‌স্কি এবং আরো বহু জনের নাম। সোভিয়েত ইউনিয়নের সবচেয়ে প্রতিভাশালী ভূতত্ত্ববিদ্ হচ্ছেন আকাদেমি-সভ্য ভ. আ. ওর্বুচেভ্।

আমাদের গ্রহটির ইতিহাস বিরাট। যদি পৃথিবীতে জীবনের আবির্ভাবের মুহূর্ত থেকে ইতিহাস লিখতে হত এবং প্রত্যেক শতাব্দীর কথায় একটি পৃষ্ঠা ভর্তি করা হত তবে বইখানা এক কিলোমিটার উঁচু হয়ে যেত। কেবল একবার পাতা উল্‌টে যেতেই একজন মানুষের সারা জীবন কাবার হয়ে যেত।

আমাদের এই বইখানা তো পকেটে রেখে দেওয়া যায়। এতে আর পৃথিবীর ইতিহাসের কতটুকু বলা সম্ভব? কেবল সবচেয়ে প্রধান, সবচেয়ে দরকারী বিষয়গুলিই এতে বলা চলে।

পড়ে-থাকা চিহ্ন থেকে পৃথিবীর ইতিহাস অধ্যয়ন করা কষ্টসাধ্য। এখনো লোকে পৃথিবীর সব কথা জানে না, তবে প্রত্যেক বছরই নতুন নতুন আবিষ্কার হচ্ছে।

গত কয়েক বছরের মধ্যে পৃথিবীর ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ের কাল নির্ণয় করার পুরানো উপায়গুলিকে উন্নত করা হয়েছে এবং নতুন কিছু উপায় আবিষ্কার করা হয়েছে। এই আবিষ্কারগুলিই বিশেষভাবে চিত্তাকর্ষক। পৃথিবীর জীবনের

এক এক অধ্যায় কয়েক হাজার বছর থেকে কোটি কোটি বছর পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে।

আমাদের বইটির নতুন সংস্করণে আমরা পুরানো মত পালটে দিয়েছি। ইংরেজ বৈজ্ঞানিক ৎসেইনার্ তার বিরাট গবেষণায় যে-সব তথ্য পেয়েছেন সেগুলি সন্নিবেশিত করে দিয়েছি।

পৃথিবী কি সব সময় এই রকমই ছিল ?

প্রশ্নটি পৃথিবীবিষয়ক প্রশ্নগুলির মধ্যে একটি অতি মূল্যবান প্রশ্ন। প্রাচীন কাল থেকে ধর্ম মানুষকে শিখিয়েছে যে, সব কিছু ঈশ্বরের সৃষ্টি এবং সব সময় পৃথিবীর চেহারা এখনকার মতই ছিল, এবং এ-বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা পাপ।

কিন্তু ব্যাপারটা কি আসলে তাই ?

এখন মানুষ পৃথিবীর ইতিহাস পড়তে শিখেছে। যেখানে ভূস্তরে উদ্ভিদ এবং প্রাণীর রক্ষিত অবশেষ ভালভাবে দেখা যায়, সেখানে এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যেতে পারে।

ভূস্তরের কথা বলতে গিয়ে এঙ্গেল্স্ দেখিয়ে দিয়েছেন যে ভূতত্ত্ব শুধু একাদিক্রমে গঠিত এবং একের পর এক ন্যস্ত ভূতাত্ত্বিক স্তরই উদ্ঘাটিত করে না, এই সমস্ত স্তরে রক্ষিত মৃত প্রাণীর খোলস এবং কঙ্কাল, যে সব গাছ এখন নেই সেগুলির গুঁড়ি, পাতা, ফল ইত্যাদিও উদ্ঘাটিত করে। বলা দরকার যে সম্পূর্ণ পৃথিবীরই যে শুধু ইতিহাস আছে তা নয়, বর্তমান ভূপৃষ্ঠ এবং তার উপরকার উদ্ভিদ ও প্রাণীরও ইতিহাস আছে।

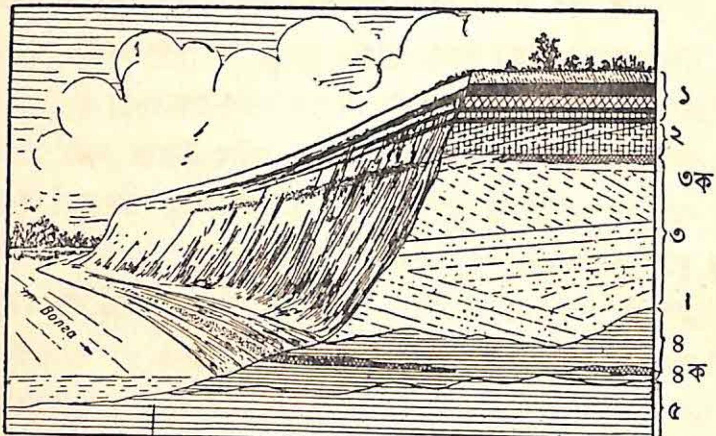
পভোলঝে-র উদাহরণটি নেওয়া যাক। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে সোভিয়েত দেশের বিজ্ঞান আকাদেমি এখানে একটি ভূতাত্ত্বিক অভিযাত্রীদল পাঠিয়েছিলেন। যেখানে ভূস্তর সবচেয়ে ভাল-ভাবে দেখা যায় (বা ভূতাত্ত্বিকেরা যাকে বলেন ভাল 'ছেদ') সেখানটা অভিযাত্রীদলের অনুসন্ধান করার কথা ছিল, প্রাণী এবং উদ্ভিদের জীবাশ্ম সংগ্রহ করার কথাও তাঁদের ছিল।

পর পর কতকগুলি জায়গা ঘুরে দেখে অভিযাত্রীদল ভোল্‌গার নীচের দিকে চ্যর্‌নি ইয়ার্‌ শহরের কাছটা বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে অনুসন্ধান করতে মনস্থ করলেন।

সেখানে সমতল বালুকাময় তীরভূমিতে নদীবিধৌত এক ছেদে বিভিন্ন প্রাণীর প্রচুর হাড় ইতস্তত ছড়ানো ছিল। বুনো পুরুষ-মহিষের অনেক জীবাশ্ম পাওয়া গেল সেখানে। তাদের শিংগুলো এত বড় যে উক্রাইনের সব চেয়ে বড় ষাঁড়-গুলোও তাদের তুলনায় রোগা-প্যাঁকাটি বাছুর বলে মনে হয়। হরিণের শিং পাওয়া গেল, লম্বায় দু মিটার। পাওয়া গেল বুনো উটের হাড়, তথাকথিত ত্রগোন্‌থেরি হাতীর (Elephas trogontherii) হাড়, যারা সুপরিচিত ম্যামথ্‌-এর নিকটমত পূর্বপুরুষ। গুহাবাসী সিংহ, নেকড়ে বাঘ, শেয়াল, খরগোশ আর বুনো ঘোড়ার হাড়ও পাওয়া গিয়েছিল। সব হাড় আস্ত ছিল না। কতকগুলো ঠুন্‌কো, সহজেই ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছিল। আর কতকগুলো পাথরের মত শক্ত। কিছু হাড় সাদা চূণের আবরণে ঢাকা, কিছু পরিষ্কার, মসৃণ। কালো হাড় ছিল, সাদা হাড় ছিল, তামাটে ছিল, হল্‌দে ছিল। কতকগুলোর

ভাঙা কিনারা ছিল ধারালো, কিছু দেখতে নুড়ির মত, নদীতে সেগুলি মসৃণ হয়ে গিয়েছে। এসব দেখে বোঝা গেল যে জীবাবশেষগুলি আগে মাটির বিভিন্ন স্তরে ছিল, পরে নদী যখন মাটি ধুয়ে ধুয়ে পলিমাটি, বালি আর কাদা নিয়ে এসেছে তখন তাদের সঙ্গে প্রাণীগুলির হাড়ও তীরে ভেসে এসেছে।

উঁচু খাড়া নদীর পাড় পরীক্ষা করে দেখা গেল যে নীচে



চিত্র ১॥ নিঝ্‌নিয়ে পভোল্‌ঝো-তে চ্যর্‌নি ইয়ারে ভূমিস্তরের ছেদ ১. মাটির আবরণ এবং চকোলেট রঙের কাদা, যার ভিতরে সামুদ্রিক শঙ্খ আছে (খফালিন্ সাগর) ২. দোআঁশ মাটি, এর ভিতরে ম্যামথের অবশেষ আছে ৩. কোসারীয় বালি, এর ভিতরে ত্রগোন্‌থেরি হাতী, অতিকায় হরিণ এবং অন্যান্য প্রাণীর হাড় আছে (৩ক—পীট্ কয়লার ডিপো) ৪. কাদা, এর ভিতরে প্রাচীন হাতী এবং মার্ক গণ্ডারের অবশেষ আছে (৪ক—পীট্ কয়লা) ৫. কোয়ার্টারনারি পর্যায়ের একেবারে গোড়ার কাদা।

জলের কাছে লাল বা নীল ঘন কাদা রয়েছে। তার উপরে জায়গায় জায়গায় পাথর, তার পর নুড়ি, তারো পরে রয়েছে বালি। আরো উপরে ঘন দোঁ-আশ মাটি (যার নীচে জায়গায় জায়গায় প্রারম্ভিক স্তরের পাথুরে কয়লা বা Peat ও ছিল) আর সব শেষে, সব কিছুর উপরে লাল চকোলেট রঙের কাদা, তার উপর আজকালকার কাদার আবরণ [চিত্র ১]।

স্তরগুলির দিকে একবার তাকিয়েই মনে হল যে তাদের কোনোটার ভিতরেই হাড় নেই। প্রচুর ঝিনুকই কেবল চোখে পড়ল। সেগুলি প্রধানত দুটি স্তরে ছিল। উপরে চকোলেট রঙের কাদায় আর নীচে বালির ভিতরে। উপরের স্তরগুলিতে সামুদ্রিক শঙ্খ পাওয়া গেল, যে রকম শঙ্খ এখন কাস্পিয়ান সাগরে পাওয়া যায় ঠিক সেই রকমের। নীচের স্তরগুলিতে পাওয়া গেল নদীজাত শঙ্খ।

নদীতীরের স্তরগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ করার পর জীবজন্তুর হাড় খোঁজা হল। হাড় সব স্তরেই পাওয়া গেল, কেবল উপরের (সাগরজাত) স্তরগুলি ছাড়া। সেখানে একটা হাড়ও ছিল না।

সব চেয়ে বেশি হাড় পাওয়া গেল নীচের বালুস্তরে, ভূতত্ত্ববিদদের কাছে সে বালুস্তর 'কোসারীয়' নামে পরিচিত। এই বালুস্তর জায়গায় জায়গায় একেবারে জলের কাছ পর্যন্ত এসেছে। নদী বালি ধুয়ে নিয়ে যাবার পর তার ভিতরকার হাড়গুলি নদীর পাড়ে পড়ে রয়েছে।

কিন্তু অভিযাত্রীদলের সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক আবিষ্কার হচ্ছে ত্রগোন্‌থেরি হাতীর মাথার খুলি। পৃথিবীতে এই প্রথম এ খুলি না-ভাঙা অবস্থায় পাওয়া গেল। লোহার ফিতে দিয়ে সেটিকে বাঁধা হল, প্লাস্টার অব প্যারিস দিয়ে ঢেকে দিয়ে বাক্‌সে পোরা হল। বাক্সের আকার এত বড় হয়ে গেল যে মালগাড়ির দরজা দিয়ে ঢোকানোই গেল না। অনেক কষ্টে বাক্‌সটা বিজ্ঞান আকাদেমিতে এসে পৌঁছেছিল।

এখন এই খুলিটাকে মস্কোয় বিজ্ঞান আকাদেমির 'জীবাশ্ম-বৈজ্ঞানিক' যাদুঘরে দেখতে পাওয়া যায়।

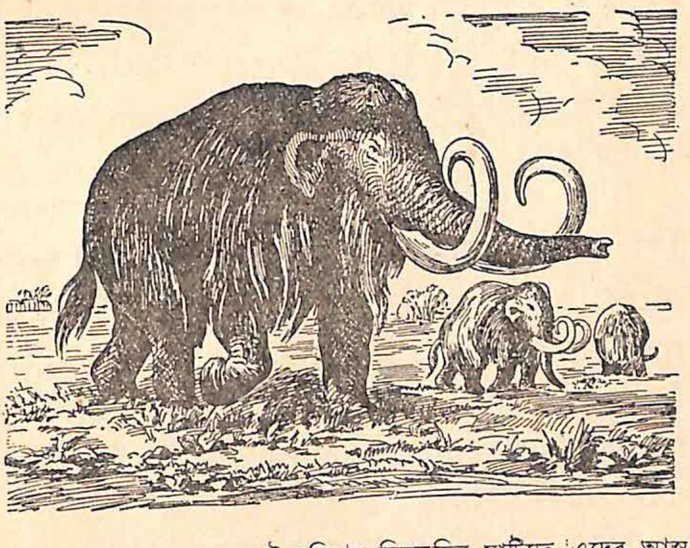
অন্য সব স্তরে হাড় কম পাওয়া গেল বটে, কিন্তু সে সব স্তরেও মূল্যবান সব আবিষ্কার হল। তামাটে দো-আঁশ মাটির ভিতরে, সামুদ্রিক কাদার নীচে ম্যামথ্-এর হাড় পাওয়া গেল। [চিত্র ২] আর কোসারীয় বালির নীচে কাদায়—তথাকথিত প্রাচীন হাতী—এলিফাস আন্তিকোয়াস্ এবং বিশেষ এক ধরণের গণ্ডার—মার্ক গণ্ডারের (merck rhinoceros) অস্থি পাওয়া গেল।

এইভাবে প্রমানিত হল যে ভোল্‌গার তীরে, এখন যেখানে ক্ষেত-প্রান্তর, বসতি-গ্রাম ইত্যাদি ছড়িয়ে আছে, সেখানে এক কালে খ্ফালিন্ সাগর (khvalin Sea) ছিল। আর তারো আগে ছিল বিরাট এক কোসার নদী (chosar river)। এই নদীর পাড় বরাবর জন্তুজানোয়ার বাস করত, বাস করত গণ্ডার, ত্রগোনথেরি হাতী, অতিকায় হরিণ, বুনো উট, গুহাবাসী সিংহ ইত্যাদি। এখন সে সব একেবারে লোপ পেয়ে গিয়েছে।

তার মানে এখন যেখানে আমাদের শহরগুলি রয়েছে সেখানে সব সময় শুকনো ডাঙা ছিল না, আর জন্তুজানোয়ার-গুলিও সব সময় আজকালকার মত ছিল না।

অনুসন্ধান ও গবেষণার থেকে যে সিদ্ধান্তটি অভিযাত্রীদল করলেন তা হচ্ছে এই যে, যতো পুরনো (যত গভীর) স্তর, তার ভিতরে আজকালকার প্রাণীর হাড়ের মত হাড় ততো কম।

এই আবিষ্কার সর্বপ্রথম হয়েছে ৪০০ বছর আগেই, কিন্তু নিশ্চিতভাবে স্বীকৃত ও দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হয়েছে কেবল উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে।



চিত্র ২ ॥ ম্যামথ। সাইবেরিয়ার চিরতুহিন মাটিতে এদের আস্ত শব পাওয়া গেছে। লেনিনগ্রাদে এখন এগুলি রয়েছে।

বিপুল তুষার সম্পাত

জলবায়ু কি সব সময় এখনকার মতই ছিল ?

যে কেউ বলতে পারে যে জলবায়ু সব সময় একরকম থাকে না। বৃষ্টিহীন বছরের পর বর্ষাকুল বছর আসে, শীতের পর আসে গ্রীষ্ম। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে জলবায়ুর এই পরিবর্তন উদ্ভিদ এবং প্রাণীদের জীবনে বিশেষভাবে প্রতিফলিত হতে পারে না। তুন্দ্রার উদ্ভিদ্‌কূল এখন যেমন অর্থাৎ মেরু-দেশীয় বার্চ গাছ, ছোট ছোট নলখাগড়া, গুল্ম ও লিচেন্ (lichen) বা সেখানে যে সব জীবজন্তু বাস করে সেইসব জীবজন্তু, মেরু শৃগাল, লেমিঙ্ (lemming), বল্‌গা হরিণ ইত্যাদি তো শীতাক্রান্ত জায়গায় অল্প সময়ে জন্মাতে পারে না। কিন্তু চিরকালই কি এই রকম ছিল ? সব সময়ই কি সাইবেরিয়া শীতল ছিল, আর ককেসাস ও ক্রিমিয়া কি এখনকার মত উষ্ণ ছিল ?

বিভিন্ন জায়গার গুহায়, যেমন ক্রিমিয়া ও ককেসাসের গুহায় প্রাচীনকালের মানুষের সাংস্কৃতিক চিহ্নের খবর অনেক আগেই জানতে পারা গিয়েছে। সেখানে মাটির বাসন, পাথরের ছুরি, চাঁচনি (scraper) এবং অন্যান্য গৃহস্থালির জিনিসপত্রের ভাঙা টুকরো পাওয়া গেছে। পাওয়া গেছে জীবজন্তুর ভাঙা হাড় এবং বহু প্রাচীনকালে নিভে যাওয়া বহ্নি-উৎসবের অবশেষ।

বত্রিশ বছর আগে গ, আ, বন্‌চ্-অস্‌মোলোভ্‌স্কি-র পরি-চালনায় একদল পুরাতত্ত্ববিদ্ এই সব গুহার খনন কার্য শুরু

করেন এবং উল্লেখযোগ্য সব আবিষ্কার করেন। বাইদার্‌স্‌কি উপত্যকায় ক্রিমিয়া গুহায় এবং সিম্‌ফেরাপোল্‌-এর চারপাশে কতকগুলি সাংস্কৃতিক স্তর* পাওয়া গেছে। এগুলি একটির পর একটি অবস্থিত। নীচের এবং মাঝখানকার স্তরগুলিকে বৈজ্ঞানিকরা মানুষের ইতিহাসের প্রাচীন প্রস্তর-যুগের অন্তর্ভুক্ত বলে স্থির করেছেন। এই সময় মানুষেরা অ-মার্জিত ধরনের অমসৃণ পাথরের তৈরি অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করত। এই জন্যে এই যুগের নাম প্যালিওলিথিক বা প্রাচীন প্রস্তর যুগ। আর উপরের স্তরগুলিকে তাঁরা ফেলেছেন ধাতু-যুগের মধ্যে। যখন মানুষ অস্ত্রশস্ত্র ধাতু দিয়ে অর্থাৎ তামা, ব্রোঞ্জ, লোহা ইত্যাদি দিয়ে বানাতে শিখেছে। মধ্যবর্তী যে স্তরগুলিতে নব্য-প্রস্তর যুগের (নিওলিথ) চিহ্ন থাকবার কথা সে স্তরগুলি সেখানে পাওয়া যায়নি। এই যুগে মানুষ পাথর পালিশ করতে এবং ছেঁদা করতে শিখেছে এবং কাদা দিয়ে বাসনপত্র বানাতে শিখেছে।

প্রাচীন প্রস্তর যুগের (প্যালিওলিথ্‌) স্তরগুলিতে মাটির তৈরি কোনো পাত্রের একটা ভাঙা টুকরোও পাওয়া যায়নি, পাওয়া যায়নি গৃহপালিত জন্তুর একখানি হাড়ও (এই সব জিনিস কেবল উপরের স্তরগুলিতে পাওয়া গিয়েছে)। প্যালিওলিথিক মানুষ মাটির বাসনপত্র বানাতে শেখেনি। তারা গৃহস্থালির ব্যবহার্য সমস্ত জিনিসই পাথর বা হাড় দিয়ে

* যে সব ভূমিস্তরে মানুষের সংস্কৃতির অবশেষ থাকে সেগুলিকে সাংস্কৃতিক স্তর বলা হয়।

তৈরি করত। বোধ হয়, তাদের কাছে অন্য সব জিনিসপত্রও ছিল, কিন্তু সেগুলি নষ্ট হয়ে গেছে। পাথর এবং হাড়ের তৈরি জিনিসপত্র বিভিন্ন ধরনের হত। যেমন বর্শার ফলা (তীর ধনুক বানাতে প্যালিওলিথিক মানুষ শেখেনি), চামড়া ছাড়াবার চাঁচনি, পাথর জুড়ে বানানো পাত—ছুরি, ছুঁচ ইত্যাদি।

প্রাচীন প্রস্তর-যুগের মানুষের কোনো গৃহপালিত প্রাণীও ছিল না। তাদের বহ্নি-উৎসবের যে অবশেষ পাওয়া গেছে তার ভেতর কেবল বুনো জন্তুজানোয়ারের হাড়ই পাওয়া গেছে, যেমন ম্যামথ্, গণ্ডার, অতিকায় হরিণ, গুহাবাসী সিংহ, গুহাবাসী ভালুক, হায়না, পাখি ইত্যাদির হাড়।

কিন্তু সেই সময়কার অন্য সব জায়গায়, যেমন ক্রাস্নো-ইয়ার্স্ক্-এর কাছে আফোন্তভ্ পাহাড়ে, ভোরোনেঝ্-এর কাছে কস্তেন্কায় জীবজন্তুর হাড়ের ভেতরে নেকড়ে বাঘের হাড়ের অবশেষ পাওয়া গেছে। কিছু বৈজ্ঞানিকের মতে এগুলি পোষ-মানানো নেকড়ে বাঘের হাড়। আর আফোন্তভ পাহাড়ের অস্থি-অবশেষের ভেতরে কতকগুলো হাড় পাওয়া গেছে যা একেবারে বল্গা হরিণের হাড়ের মত। এই সব জিনিস থেকে অনুমান করা যায় সম্ভবত প্রাচীন প্রস্তর যুগের শেষেই মানুষের সঙ্গে গৃহপালিত প্রাণীর আবির্ভাব হয়। এই সব প্রাণী ছিল কুকুর (পোষ মানানো নেকড়ে বাঘ) এবং বল্গা হরিণ।

ক্রিমিয়ার প্রাচীন প্রস্তর-যুগের গুহা থেকে পাওয়া

জীবজন্তুর হাড়গুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করার সময়ে আর একটি মূল্যবান আবিষ্কার করা হল। মাঝখানকার স্তরগুলিকে বৈজ্ঞানিকেরা প্রাচীন প্রস্তর যুগের দ্বিতীয়ার্ধের অর্থাৎ উচ্চ প্যালিওলিথিক যুগের অন্তর্ভুক্ত করেন। এখানে মেরু শৃগাল, উইলোপ্ টার্মিগান, বল্‌গা হরিণ, মেরু অঞ্চলের স্কাইলার্ক, খরগোশ ইত্যাদির অসংখ্য হাড় পাওয়া গেছে। এখন এগুলি দূর উত্তরাঞ্চলের অধিবাসী। কিন্তু মেরুবৃত্তের মধ্যেকার জলবায়ু, সকলেই জানে যে ক্রিমিয়ার মত উষ্ণ নয়। সুতরাং ক্রিমিয়ায় মেরু অঞ্চলের প্রাণী যখন বাস করত তখন সেখানকার জলবায়ু নিশ্চয়ই এখনকার চেয়ে শীতল ছিল। ক্রিমিয়ায় উচ্চ প্রাচীন প্রস্তর-যুগের মানুষের বহ্নি-উৎসবের কয়লা নিয়ে গবেষণা করার পরও বৈজ্ঞানিকেরা এই সিদ্ধান্তই করলেন যে, এদের জ্বালানি ছিল উত্তর অঞ্চলের অ্যাশ্ বেরী, জুনিপার্ এবং বার্চ গাছ। ঠিক একই ব্যাপার দেখা গেল ককেসাসের উচ্চ প্রাচীন প্রস্তর-যুগের লোকবসতিতে, পার্থক্য অত্যন্ত অল্প। সেখানে পাওয়া গিয়েছিল তাইগা অঞ্চলের প্রাণী এল্‌ক্ (elk) এবং আল্পস্ পর্বতমালার প্রান্তরের প্রাণী স্যামর এবং কয়েক রকমের ইঁদুর, যেগুলি এখন উঁচু পাহাড়ের উপরে বাস করে। তখন তারা থাকত প্রায় সমুদ্রের কাছে।

প্রাচীন প্রস্তর যুগের দ্বিতীয়ার্ধের মানুষের বহু জিনিস-পত্রের অবশেষ সোবিয়েত ইউনিয়নের অন্যান্য বহু জায়গায় পাওয়া গেছে ঃ ওকা, দন, দ্নেপর্, উরাল, সাইবেরিয়ায় (ওবি, ইনিস, লেনা এবং আঙ্গারে)। এখন সব জায়গাতেই জীব-

জন্তুর অবশেষের ভিতরে মেরুদেশীয় প্রাণীর অস্থি-অবশেষ পাওয়া গিয়েছে। এসব প্রাণী এখন আর এ অঞ্চলে বাস করে না। ঠিক এই ব্যাপারই দেখা গেছে বিদেশে—ইউরোপের দেশগুলিতে। এ সবের অর্থ হচ্ছে এই যে, উচ্চ প্রাচীন প্রস্তর-যুগের জলবায়ু এখনকার চেয়ে বেশি উগ্র ছিল।

কিন্তু সেই সুদূর অতীতে যদি ক্রিমিয়া আর ককেসাসের জলবায়ুই শীতল থেকে থাকে তবে এখন যেখানে মস্কো আর লেনিনগ্রাদ রয়েছে সেখানের জলবায়ু ছিল কেমন? উত্তর এবং মধ্য সাইবেরিয়াতেই বা তখন জলবায়ু কেমন ছিল, যেখানে এখন শীতকালে '৪০ ডিগ্র' সেন্টিগ্রেড তাপাঙ্ক হামেশা দেখা যায়?

ইয়োরোপ এবং উত্তর এশিয়ার এক বিশাল অঞ্চল তখন ঘন বরফে ঢাকা ছিল। জায়গায় জায়গায় সে বরফ পুরু হত দু কিলোমিটার। কিয়েভ্, খারকোভ্ এবং ভোরোনেঝ্ এর দক্ষিণে এই বরফ বিরাট দুই জিভের মত, এখনকার নদী দ্নেপর্ এবং দনের অববাহিকায় নেমে এসেছিল। উরাল এবং আলতাই ছিল পুরু বরফের আবরণে ঢাকা, যা পরে দূরে অবস্থিত সমভূমিতে নেমে এসেছিল। এইরকম হিমবাহ ককেসাস পর্বতেও ছিল। তার বিস্তার ছিল একেবার সাগর অবধি। এখন যে-সব প্রাণী উঁচু পাহাড়ের উপরে বরফের ভিতর থাকে সে-সব প্রাণীর অবশেষ এই জন্যেই সমুদ্র-তীরবর্তী প্রাচীন প্রস্তর-যুগের মানুষের মধ্যে পাওয়া গেছে। ক্রিমিয়া তখন নানা প্রাণীর আশ্রয়স্থল। উত্তর দিক থেকে, অর্থাৎ

ফিনল্যাণ্ড এবং স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া থেকে রুশীয় সমভূমিতে নেমে-আসা বিরাট এক হিমানী-সম্প্রপাত সেখানে যে-সব জীবজন্তু বাস করত তাদের দক্ষিণ দিকে হঠে যেতে বাধ্য করেছিল। এই জন্যে ক্রিমিয়ার মত ছোট একটা জায়গায় স্তেপ্ এবং মেরু অঞ্চলের প্রাণীর এমন এক সংমিশ্রণ ঘটে।

পশ্চিম দিকে এই হিমবাহ ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত ঢেকে ফেলে এবং আঞ্চলিক শৈলজাত হিমবাহের সঙ্গে মিশে এক হয়ে যায়। যখন এর আকার সবচেয়ে বড় হয়ে যায় তখন সেটি লণ্ডন এবং বার্লিনের দক্ষিণ অবধি চলে এসেছিল।

স্পেন, ইতালী, ফ্রান্স এবং অন্যান্য জায়গায় শৈলজাত হিমবাহ দূরস্থিত সমভূমিতে নেমে গিয়েছিল। আল্প্সে হিমবাহগুলি এত নীচে নেমে এসেছিল যে পাহাড়ের পাদদেশের আর একটা হিমবাহের সঙ্গে তা মিশে গিয়েছিল।

এশিয়ায়ও উল্লেখযোগ্য তুষার সম্পাত হয়েছে। উরাল আর নোভাইয়া জেম্ল্যা-র পূর্বদিকের ঢালু জায়গা থেকে এক হিমবাহ নিম্নভূমিতে নেমে এসেছিল। তার সঙ্গে ইনিসীর দক্ষিণ তীর থেকে এবং হয়ত তাইমীর থেকেও তুটি হিমবাহ এসে মিলেছিল। একসঙ্গে মিশে গিয়ে এই অতিকায় হিমবাহ একটানা বরফের পাতের মত পশ্চিম সাইবেরিয়ার নিম্নভূমিকে একেবারে ঢেকে দিয়েছিল ৬০° অক্ষাংশের একটু দক্ষিণ অবধি।

ইনিসীর পূব দিকে, ইয়াকুৎ স্বয়ংতন্ত্রী রিপাবলিকের মধ্য অঞ্চলে ক্রমাগত বরফ জমে যাচ্ছিল, গরমের সময় সবটা গলবার

সময় পাচ্ছিল না। এগুলি এক নিশ্চল, বিস্তৃত তুষারক্ষেত্র গড়ে তোলে। কিন্তু উত্তর দিকের স্থলভাগের চওড়া ফালিটি, নব সাইবেরীয় দ্বীপপুঞ্জসুদ্ধ তখন মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিল। এই অঞ্চলটিও তখন নিরবচ্ছিন্ন তুষারে ঢাকা। এইভাবে, এশিয়ার প্রায় সমস্ত উত্তরাংশ তুষার সমাধিস্থ ছিল।

অন্য কয়েকটি দেশেও উল্লেখযোগ্য তুষার সম্পাত হয়েছে। যেমন, উত্তর আমেরিকায় হিমবাহের আচ্ছাদন তিনটি তৈরি হয়েছিল বিশালকায় হিমবাহ থেকে। তিনটি জন্মেছিল তিনটি কেন্দ্রে—ল্যাব্রাডর্, কিভাতিন্স্কি এবং কার্দিলের্স্কি-তে এই বিপুলকায় হিমবাহের দক্ষিণ প্রান্ত 'দি গ্রেট' হ্রদের অনেক দক্ষিণ অবধি চলে গিয়েছিল। কিন্তু স্থলভাগের উত্তর প্রান্ত দৃশ্যত তুষারমুক্ত ছিল।

অনেক বৈজ্ঞানিক মনে করেন যে ইয়োরোপ এবং এশিয়ায়ও, আমেরিকার মত কতকগুলি (চারটে থেকে ছটা) হিম যুগ ছিল। পরে এই অঞ্চলের তুষার কমে কমে এখনকার মত হয়ে গিয়েছে।

দক্ষিণ গোলার্ধেও প্রাচীন তুষার সম্পাতের চিহ্ন রয়েছে, যদিও তা খুব অল্প পরিমাণে এবং কেবল পাহাড়ের চূড়োয়। সেই সময়ে হিমরেখা এই অঞ্চলে সমকালীন হিমরেখার কয়েক শো মিটার নীচে ছিল, জায়গায় জায়গায় তা প্রায় সমুদ্রের কাছাকাছি চলে এসেছিল (যেমন নিউজিল্যাণ্ড)।

দক্ষিণ আমেরিকায় তুষার সম্পাত আন্দা এবং কর্ডিলের্-এ দেখা গেছে।

আফ্রিকার নিরক্ষীয় অঞ্চলেও হিমবাহ কেন্নি এবং কিলিম্যান্জারো আগ্নেয়গিরির ঢালু ধার থেকে, এখন যেখানে হিমবাহ হয় তার ২৭০০ মিটার নীচে অবধি নেমে এসেছিল। অ্যাটলাস্ পাহাড়েও হিমবাহ দেখে গেছে।

অস্ট্রেলিয়ায় আল্পস্ পাহাড়ে হিমবাহের চিহ্ন পাওয়া গেছে। এখানে হিমবাহ সমুদ্র-সমতলের ১০০০ মিটার উপর পর্যন্ত নেমে এসেছিল।

এই যুগটি পৃথিবীর বিপুল তুষার সম্পাতের যুগ।

হিমবাহগুলি কিরকম চিহ্ন রেখে গেছে ?

মধ্য এবং উত্তর রুশের অধিবাসীদের কাছে বড় এবং ছোট পাথর, গণ্ডশিলা এবং মাঝারি পাথর সুপরিচিত। চষা জমিতে প্রচুর সংখ্যায় এগুলি দেখতে পাওয়া যায়। কখনো কখনো এগুলির আকার খুব বড় হয় (বাড়ির মত বা তার চেয়েও বড়)। এই রকম একটি গ্রানাইটের গণ্ডশিলা থেকে লেনিনগ্রাদে প্রথম পিটারের স্মারকমূর্তির ভিত্তি বানানো হয়েছিল। কতকগুলি গণ্ডশিলা লিচেন্ গাছের মত বেড়ে উঠেছে, অনেকগুলি হাতুড়ির ঘায়ে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। এর থেকে বোঝা যায় যে এগুলি বহুকাল ভূপৃষ্ঠে পড়ে আছে। গণ্ডশিলা দেখতে সাধারণত গোলগাল হয়। আর যদি খুব কাছে নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা হয় তবে মসৃণ বহিঃপৃষ্ঠের উপরে দাগ এবং আঁচড়ের চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়। নিম্নভূমিতেও গণ্ডশিলা এখানে ওখানে ছড়িয়ে থাকে, যেখানে কোনে পাহাড় নেই সেখানেও। কোথেকে এ পাথরগুলো এল ?

মাঝে মাঝে শোনা যায় যে গণ্ডশিলা মাটি থেকে 'গজায়'। এ ধারণা কিন্তু একেবারেই ভুল। কোদাল দিয়ে একটু কোপালে বা মনোযোগ দিয়ে দেখলেই তখুনি পরিষ্কার হয়ে যায় যে মাটি, বালি কিম্বা কাদার উপরে এগুলি দাঁড়িয়ে থাকে। বৃষ্টিতে মাটি ধুয়ে যায়, বালি যায় বাতাসে উড়ে আর যেখানে গত বছর কিছুই ছিল না, সেখানে এক গণ্ডশিলা মাটির বাইরে বেরিয়ে আসে। আর এক বছরে মাটি আরো বেশি করে ধুয়ে চলে যায়, বাতাসে নেয় উড়িয়ে, আর গণ্ডশিলাটিও বড় হতে থাকে। এই জন্যে মনে করা হয় যে সেগুলি মাটি থেকে গজায়।

গণ্ডশিলার সংযুতি বিশ্লেষণ করে বৈজ্ঞানিকেরা সর্বসম্মতি-ক্রমে সিদ্ধান্ত করেছেন যে এগুলির উৎপত্তিস্থান কারেলিয়া, সুইডেন, নরওয়ে আর ফিনল্যাণ্ড। গণ্ডশিলার যে-সংযুতি সেই সংযুতির পাথর ঐ দেশগুলিতে আস্ত এক ভূত্বক তৈরি করে রয়েছে। তার ভিতর দিয়ে গিরিখাত আর নদীর খাড়ি কেটে কেটে বসে গেছে। এই ত্বক থেকে ভেঙে আসা পাথরের চাঁই-ই গণ্ডশিলা। এগুলি ছড়িয়ে পড়েছে সোভিয়েতের ইউরোপীয় অংশে, পোল্যাণ্ডে, জার্মানিতে।

কিন্তু কেন এবং কী ভাবে এগুলি উৎপত্তিস্থান থেকে এত দূরে চলে এসেছে? আগে, আশি বছর আগে, মনে করা হত যে যেখানে এখন গণ্ডশিলা দেখতে পাওয়া যায় সেখানে আগে ছিল এক সাগর এবং তুষার শৈলের সঙ্গে গণ্ডশিলাগুলি এসেছিল, মেরুসাগরে ভাসমান তুষারশৈল (আইস্‌বার্গ)

হিমবাহের ধার থেকে ভেঙে সাগরে নেমে আসার সময় যেমনভাবে পাথরের চাঁই ধস নিয়ে আসে তেমনিভাবে। এখন এই ধারণাকে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। এখন সব বৈজ্ঞানিক এ বিষয়ে একমত যে গণ্ডশিলাগুলি বিরাট এক হিমবাহের দ্বারা বাহিত হয়ে এসেছে এবং হিমবাহটি স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া উপদ্বীপ থেকে নেমে এসেছিল।

রুশ দেশের গণ্ডশিলাগুলির সংযুতি এবং পরিব্যাপ্তি বিশ্লেষণ করে বৈজ্ঞানিকেরা প্রমাণ করেছেন যে সাইবেরিয়া, মেরু অঞ্চলের উরাল পর্বতে, নোভাইয়া জেমল্যা, আলতাই এবং ককেসাস্ পর্বতেও হিমানীসম্প্রপাত হয়েছিল। পাহাড় থেকে নামার সময় হিমবাহগুলি সঙ্গে করে গণ্ডশিলা নিয়ে এসেছিল এবং সেগুলিকে দূরস্থিত নিম্নভূমিতে রেখে দিয়েছিল, এইভাবে নিজেদের গতিপথের দুপাশে চিহ্ন রেখেছিল। বর্তমানে উরাল এবং নোভাইয়া জেমল্যার পাহাড়ের পাথর থেকে তৈরি গণ্ডশিলা তোবল্স্ক, পশ্চিম সাইবেরিয়া, ইর্তিশা নদীর উৎপত্তিস্থল প্রভৃতি জায়গার কাছে দেখতে পাওয়া যায়। আর নিম্ন ইনিসীয় অঞ্চলের গণ্ডশিলা পাওয়া যায় পশ্চিম সাইবেরিয়ার মধ্যভাগে, ওবা নদীর পাড়ে সামারোভো গ্রামের কাছে। চলতে চলতে দুটি অতিকায় হিমবাহের পথে দেখা হয়ে গিয়েছিল। একটি উরাল আর নোভাইয়া জেমল্যা থেকে আসছিল আর অন্যটি আসছিল সাইবেরিয়ার পূব ধার—ইনিসী বা তাইমীর নদীর দক্ষিণ তীর থেকে। বিশালকায় হিমবাহ দুটি মিশে গিয়ে একটি নিরবচ্ছিন্ন

হিমক্ষেত্র তৈরি করে ফেলল, পূর্ব সাইবেরিয়ার উত্তর দিকের সমস্তটা ঢেকে ফেলল।

পথের মাঝে কঠিন পাথর পড়লে হিমবাহ সেগুলিকে ঘষতে ঘষতে মসৃণ করে ফেলে এবং তাদের গায়ে গভীর দাগ আর আঁচড়ও লাগিয়ে দেয়। এই রকম মসৃণ আর দাগ-কাটা পাথরের টিলা 'ভেড়ার কপাল' নামে পরিচিত। কারেলিয়ার কোল্‌স্‌কি উপদ্বীপে এগুলি সবচেয়ে বেশি দেখতে পাওয়া যায়।

তাছাড়া হিমবাহ প্রচুর পরিমাণ বালি আর কাদা সঙ্গে নিয়ে এসেছিল, তার গতিপথের দুধার বরাবর ঢেউয়ের মত জমিয়ে রেখেছিল। এখন সেগুলি জঙ্গলে ঢাকা। ঢেউগুলি দেখতে খুব সুন্দর, ভাল্‌দাইয়ের (কালিনিন্‌স্কি অঞ্চলে) ঢেউগুলি একটি উদাহরণ। এগুলিকে বলা হয় 'গ্রাবরেখা'। এগুলিকে দেখে ভূতপূর্ব হিমবাহের ধার কোথায় ছিল তা বেশ বোঝা যায়। হিমবাহ গলে গেলে, সেটি যতো জায়গা জুড়ে ছিল সব কাদা, গণ্ডশিলা আর নুড়িতে ছেয়ে গেল। গণ্ডশিলায় ভর্তি কাদার তৈরি এই আচ্ছাদন এখনকার মাটি তৈরি করেছে, যে মাটি এখন চাষ করা হয় সেই মাটি।

ঠিক একই রকম প্রাচীন হিমবাহ পশ্চিম ইয়োরোপে, উত্তর আমেরিকায়, অস্ট্রেলিয়া এবং আফ্রিকায় দেখা গেছে।

কোনো এককালে পৃথিবীতে যে তুষারসম্পাত ঘটেছিল তা অতীতের চিহ্ন থেকে এত স্পষ্ট যে কেউ তাতে আর সন্দেহ প্রকাশ করে না। আজকালকার হিমবাহগুলিও একই রকম

চিহ্ন রেখে যায় বলে আমরা এবিষয়ে আরো নিশ্চিত হয়েছি। আজকাল আমাদের এবং অন্যান্য দেশের পাহাড়ে এরকম হিমবাহ হয়। বিপুল তুষারসম্পাতের যুগে যেগুলি সারা পৃথিবীকে ছেয়ে ফেলেছিল, এগুলি তাদের চেয়ে আকারে ছোট, এই যা তফাত।

এইভাবে, উচ্চ প্রাচীন প্রস্তরযুগের গুহার খননকার্যের সময়ে ক্রিমিয়ায় প্রাপ্ত জীবজন্তুর অস্থি-অবশেষ থেকে ঠিকই বোঝা গিয়েছিল যে কোনো কালে সেখানে এখনকার চেয়ে শীতল জলবায়ু ছিল।

কিন্তু, ক্রিমিয়ার অবশেষগুলি তো বিপুল তুষারসম্পাতের যুগের আগেকার বা পরেকার হতে পারে। এই প্রশ্নের একেবারে নির্ভুল উত্তর আমাদের কাছে আছে।

ক্রিমিয়ায় উচ্চ প্রাচীন প্রস্তর যুগের যেমন অবশেষ পাওয়া গেছে তেমন অবশেষ কেবল সোভিয়েত দেশের মধ্যে নয়, পশ্চিম ইউরোপের অন্যান্য দেশেও পাওয়া গেছে। এ দেশগুলি বিপুল তুষারসম্পাতের সময়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে তুষারাচ্ছাদিত ছিল। কিন্তু কোথাও এই অবশেষ হিমবাহের নীচে দেখা যায়নি। এ থেকে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় যে আলোচ্য অবশেষগুলি বিপুল তুষারসম্পাতের যুগেরই (এবং কয়েকটি হিমবাহ গলার সময়কার) অবশেষ।

গত পনেরো বছরে অত্যন্ত মূল্যবান অনেক আবিষ্কার করা হয়েছে। দ্নেপর এবং দেস্‌না নদীর উপরে নোভগোরোদ্‌-সেভের্‌স্কি-র কাছে, হিমবাহের স্তরের নীচে নিম্ন প্রাচীন

প্রস্তর-যুগের মানুষের আবাস এবং পাথরের তৈরি অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। এসব থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, মানুষ কেবল যে তুষারসম্পাতের এবং হিমবাহের যুগেই ছিল তা নয়, তার আগেও ছিল।

অতি সম্প্রতি (১৯৫০ খৃষ্টাব্দে) নিম্ন প্রাচীন প্রস্তর-যুগের মানুষের আবাসস্থল কোসারীয় নদীর অবক্ষেপের ভিতরে, স্তালিনগ্রাদের কাছে, কাদার নীচে পাওয়া গেছে। এই মূল্যবান আবিষ্কারটি থেকে বিভিন্ন ভূতাত্বিক ঘটনার বয়স নির্ণয়ে চিত্তাকর্ষক সব সিদ্ধান্ত করা গেছে।

মাটির আরো প্রাচীন স্তর বিশ্লেষণ করে মানুষ নিশ্চিত হয়েছে যে এক সময় সাইবেরিয়ায় এমন সব গাছ জন্মাত যা এখন কেবল কৃষ্ণসাগরের উপকূলে জন্মায়। চিরশ্যামল লরেল, ম্যাগ্নোলিয়া এবং ডুমুর গাছ এখনকার বারাবিন্‌স্কি প্রান্তরের (পশ্চিম সাইবেরিয়া) নদী এবং হ্রদের ধারে ধারে জন্মাত। উক্রাইনের জঙ্গলে ছিল বানর, তাল গাছও জন্মাত সেখানে, আর বইকাল এবং আজোভ হ্রদ প্রান্তরে উটপাখি আর আন্তিকালের হরিণ চরে বেড়াত। এগুলিকে এখন কেবল আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকায় দেখা যায়।

পৃথিবীতে বিপুল তুষারসম্পাত হয়েছিল কেন

পৃথিবীতে অজ্ঞেয় কোনো বস্তু নেই, তবে অজ্ঞাত বস্তু আছে, যা উদ্‌ঘাটিত হবে, বিজ্ঞান এবং প্রয়োগের শক্তির দ্বারা পরিজ্ঞাত হবে—বলেছিলেন স্তালিন। বিজ্ঞান

পুরোপুরি অনুমান করতে পারেনি এমন ব্যাপার পৃথিবীর ইতিহাসে কম নয়। তার একটি হল এই বিপুল তুষার-সম্পাত। এগুলির যে চিহ্ন রেখে গেছে তা এত স্পষ্ট যে এটা যে এককালে হয়েছিল তাতে কোনো বৈজ্ঞানিক সন্দেহ প্রকাশ করেন না। কিন্তু এর উদ্ভব হয়েছিল কেন? কী কারণে বিশাল এক হিমবাহের আচ্ছাদন ইয়োরোপ, এশিয়া আর আমেরিকার সুবিস্তৃত অঞ্চলের উপর এসে পড়েছিল, আবার বিলয়প্রাপ্তই বা হয়েছিল কেন? গড় বেধ এক কিলোমিটার ধরলে এই আচ্ছাদনটি ভূপৃষ্ঠের প্রায় ৩৮০ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার অঞ্চল জুড়ে ছিল। আর সমকালীন সমস্ত হিমবাহ মাত্র ১৬০ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে আছে। কী কারণে এত বরফ জমা হয়েছিল যার ফলে সমুদ্র-সমতল অনেক নীচে নেমে গিয়েছিল। একজন বৈজ্ঞানিকের মতে ১৫০ মিটার, আরেকজনের মতে ৩০০ মিটার নেমে গিয়েছিল।

নানান রকম বৈজ্ঞানিক অনুমান বিজ্ঞানে আছে, যা দিয়ে তুষারসম্পাতের কারণ ব্যাখ্যা করা হয়।

সাধারণভাবে, দুইভাবে তুষারসম্পাতের কারণ ব্যাখ্যা করা হয়। একদল বৈজ্ঞানিক কারণটি অনুসন্ধান করেন পৃথিবীর সীমার বাইরে (জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক প্রকল্প), অন্যদল আবার মনে করেন যে পৃথিবীরই কোনো পরিবর্তন থেকে এই কারণের উৎপত্তি হয়েছিল।

সমস্ত জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক অনুমানের মূলে রয়েছে সূর্য থেকে পৃথিবীতে আসা আলোর হিসেব। পৃথিবী এবং সূর্যের

মধ্যেকার দূরত্ব বাড়ে না কমে তার উপরে নির্ভর করে এই পরিমাণ। এই ব্যাপার ঘটে জ্যোতির্বিজ্ঞানের নিয়ম অনুযায়ী। তাই, গত ৬০০,০০০ বছরে সূর্য থেকে পৃথিবীতে কত তাপ এসেছে তার পরিমাণ হিসেব করে দেখা হয়েছে। এর ফলে যখন পৃথিবী শীতল হয়েছে এবং যখন উষ্ণ হয়েছে সেই সময়কাল জানতে পারা গেছে। এই কাল ভূতাত্ত্বিক তথ্য থেকে পাওয়া কালের সঙ্গে চমৎকার মিলে গেছে। এক সময়ে সূর্যের বিকীরণ বিষয়ক অনুমান বেশ স্বীকৃতি লাভ করেছিল। বহু বৈজ্ঞানিক সূর্যের বিকীরণবিষয়ক অনুমান সমর্থন করেও মনে করেন যে কেবল ঐ এক ব্যাপার দিয়ে কোয়ার্টারনারি পর্যায়ে যে-রকম বিপুল তুষারসম্পাত হয়েছিল তার কারণ ব্যাখ্যা করা চলে না।

কিছু বৈজ্ঞানিক ভাবেন যে পৃথিবী ঘিরে বায়ুমণ্ডলস্থ কার্বন ডাই-অক্সাইড্ এবং জলীয় বাষ্পের পরিমাণের উপরই জলবায়ুর উষ্ণতা নির্ভর করে। বাতাস হচ্ছে জানলার কাচের শার্সির মত। রোদ্দুর তার ভিতর দিয়ে পৃথিবীতে আসে, আর উষ্ণ ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রতিফলিত উষ্ণ রশ্মিকে শোষণ করে নেয়। এইজন্যে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইড্ এবং জলীয় বাষ্প যত বেশি হবে জলবায়ুও তত বেশি উষ্ণ হবে, আর ওগুলি যত কম হবে জলবায়ুও তত শীতল হবে। কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং জলীয় বাষ্পের পরিমাণ পাল্টায়। আগ্নেয়-গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সময়ে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রচুর পরিমাণে আসে, তারপরে উদ্ভিদ্‌জগৎ তাকে শোষণ

করে নেয়। এইজন্যে আগ্নেয়গিরির প্রবল অগ্ন্যুৎপাতের পরে জলবায়ু উষ্ণ হয়ে ওঠে। তার পর আবার ঠাণ্ডা হয়ে যায়। এই বৈজ্ঞানিকেরা ধরেছিলেন যে যদি কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ এখনকার তুলনায় দু'তিন গুণ বেড়ে যায় তবে তাপমাত্রা বাড়বে আট-ন ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড্, আর যদি এখনকার অর্ধেক হয়ে যায় তবে তাপমাত্রা চার-পাঁচ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড্ কমে যাবে। মধ্য অক্ষাংশগুলিতে তুষারসম্পাত হবার পক্ষে এই তাপমাত্রা হ্রাসই যথেষ্ট।

অন্য বৈজ্ঞানিকেরা তুষারসম্পাতের কারণ খোঁজেন জল এবং স্থলের অন্য রকম বিন্যাস বা উষ্ণ সমুদ্রস্রোতের পরিবর্তনের ভিতর। এইভাবে দেখানো হয়েছে যে ইউরোপের তুষার-সম্পাতকে গাল্ফ স্ট্রীমের (উপসাগরীয় স্রোতের) গতির সঙ্গে জড়িত করা চলে। কোয়ার্টারনারি পর্যায়ে হয়ত একটি জলতলস্থ প্রাচীর ব্রিটেন এবং ফারেন্স্কি দ্বীপ, আইস্ল্যাণ্ড এবং গ্রীন্ল্যাণ্ডকে যুক্ত করে ছিল। এই জন্যে গাল্ফ স্ট্রীম হয়ত ইউরোপের উত্তর উপকূল বিধৌত করতে পারত না। এই উষ্ণ স্রোতটি হিমবাহ যুগে মেক্সিকো উপসাগর থেকে পানামা প্রণালী দিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে চলে যেত।

পরিশেষে, বহু বৈজ্ঞানিক আছেন যাঁরা মনে করেন যে জলবায়ুর পরিবর্তন পর্বত-সৃষ্টির প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত। পাহাড়ের উপরকার বায়ুমণ্ডলের বেধ নীচেকার চেয়ে কম। এইজন্যে সেখানে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জলীয় বাষ্পও কম। এই অঞ্চলগুলি যেন পাত্রের গায়ে সব ছিদ্রের মত। এদের

ভিতর দিয়ে তাপ মহাজাগতিক শূন্যে চলে যায়। আর্দ্রতা (জলীয় বাষ্প)-পূর্ণ বায়ু হয়ত তখন পার্বত্য অঞ্চলে এসে জমা হত ও অধঃক্ষেপের পরিমাণ বাড়িয়ে দিত। নিম্ন উষ্ণতার জন্যে এই অধঃক্ষেপ এখানে তুষাররূপে পড়ত। এর থেকেই হিমবাহ সৃষ্টির অনুকূল অবস্থা তৈরি হয়েছিল। হিমবাহগুলি পরে নিম্নভূমিতে নেমে আসে।

গিরিগঠনের প্রক্রিয়া যখন শেষ হয়ে গেল, পৃথিবীর ইতিহাসের সেই অধ্যায়ে পর্বতময় ভূপৃষ্ঠাকৃতি নদনদীর দ্বারা বিধ্বস্ত হতে শুরু করল, সমতল এবং নিচু হয়ে যেতে লাগল। বায়ুমণ্ডলের আবরণ ক্রমাগত বেশি পুরু এবং সুবিন্যস্ত হতে লাগল। জলবায়ু বেশি উষ্ণ হয়ে উঠল এবং হিমবাহের আবরণ অদৃশ্য হয়ে গেল। হিমবাহ রয়ে গেল শুধু মেরু-অঞ্চলে আর উঁচু পাহাড়ের চূড়োয় চূড়োয়। উষ্ণ জলবায়ুর আবির্ভাব হল।

এই মূল বৈজ্ঞানিক অনুমানগুলি দিয়ে পৃথিবীর বিপুল তুষারসম্পাতের কারণ ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়। আরো নানানভাবে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা হয়েছে। সেগুলি কম পরিচিত।

একজন ভূতাত্ত্বিকের পক্ষে কোনো প্রকল্প মেনে নেবার পক্ষে প্রধান বাধা হচ্ছে এই যে এগুলির কোনোটিই কোয়ার্টারনারি পর্যায়ের হিমবাহ যুগের পুনরাবৃত্তি ব্যাখ্যা করতে পারে না।

ব্যাপার হচ্ছে এই যে বেশ কিছু বৈজ্ঞানিক ভূতাত্ত্বিক

প্রকৃতির উপরেই প্রধানত নির্ভর করেন, জীবজগতের ক্রমবিকাশের ইতিহাসের উপর নির্ভর করেন না এবং তাঁরা মনে করেন যে কোয়ার্টারনারি পর্যায়ে এখন যে সব জায়গা তুষারমুক্ত, সে সব জায়গা থেকে বার বার তুষার অদৃশ্য হয়ে গেছে, পরে আবার দেখা দিয়েছে। এই বৈজ্ঞানিকদের মতে হিমবাহের আবরণের আবির্ভাব এবং বিলয় জলবায়ুর লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন অনুসরণ করেই ঘটেছে। হিমবাহ-অন্তর্বর্তী কালে জলবায়ু এখনকার চেয়ে উষ্ণ ছিল।

গিরি গঠনের সঙ্গে হিমবাহকে জড়িত করে যে বৈজ্ঞানিক অনুমানটি, সেটি কোয়ার্টারনারি পর্যায়ে জলবায়ু শীতল হবার এবং হিমবাহের গোটা যুগের আবির্ভাবের কারণ চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করে। এই মতবাদ তুষার সম্পাতের পৌনঃপুনিকতা ব্যাখ্যা করতে পারে না, কারণ কোয়ার্টারারি পর্যায়ে তুষার সম্পাত যতবার হয়েছে গিরি গঠন ততবার হয়নি। এই জন্যে এই বৈজ্ঞানিক অনুমান দিয়ে কোয়ার্টারনারি পর্যায়ে উদ্ভূত একটি হিমবাহ যুগের ব্যাখ্যাই করতে পারা যায়, যে-যুগে হিমবাহের আবরণ বারবার কমেছে ও বেড়েছে।

এর সঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে গিরি গঠন অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠে জল এবং স্থলের বিন্যাসের পরিবর্তনের সঙ্গে তুষারসম্পাতকে জড়িত করে যে বৈজ্ঞানিক অনুমান তার মধ্যে এমন একটি ত্রুটি নেই, যা অন্য সবগুলির মধ্যে আছে। অন্য সব প্রকল্প উষ্ণতার অবনমনকেই তুষারসম্পাতের মূল কারণ হিসেবে ধরে। এ কথা

স্পষ্ট যে কেবল উষ্ণতার অবনমনই তুষার সম্পাতের পক্ষে যথেষ্ট নয়। তার সঙ্গে অধঃক্ষেপের (তুষারের) পরিমাণও বাড়া দরকার। জানুয়ারী মাসে ইয়াকুৎ স্বয়ংতন্ত্রী রিপাবলিকের ভের্খোইয়ান্‌স্‌কে বাতাসের গড় তাপমাত্রা হচ্ছে – ৫০.১°। তুষারপাত হয় কিন্তু –৭০° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে। ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত সেখানে অধঃক্ষেপের পরিমাণ হচ্ছে মাত্র ১১ মিলিমিটার। তুষারাবরণের বেধও অত্যন্ত কম (১৫-৪৯ সেন্টিমিটার)। ইয়াকুৎ রিপাবলিকের ওলেক্‌মিন্‌স্‌ক্‌-এ অধঃক্ষেপের পরিমাণ বছরে সবচেয়ে বেশি—২৬২ মিলিমিটার আর সবচেয়ে কম ভের্খোইয়ান্‌স্‌ক্‌-এ—১২৮ মিলিমিটার। জুলাই মাসের রাত্রিতেই শুধু ইয়াকুতে তুষারপাত হয় তা নয়, শীতকাল সেখানে সাত মাস ধরে চলে। তবু, দৃশ্যত অনুকূল অবস্থা বর্তমান থাকা সত্ত্বেও সেখানে তুষারসম্পাত হয় না। তবে সেখানে জল চিরকাল জমে থাকে, ২০০ মিটার নীচে মাটি জমে যায়। আবার সেই সঙ্গে প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত নিউজিল্যাণ্ডে বাৎসরিক গড় উষ্ণতা ওঠে, উত্তর অঞ্চলে +১৪.৯, আর দক্ষিণ অঞ্চলে +৯.৯° সেন্টিগ্রেড। কিন্তু ৩০০০ মিটার উঁচু পাহাড়ের চূড়োয় বিরাট বিরাট হিমবাহ ঠিকই হচ্ছে। সেগুলি গ্রীষ্মমণ্ডলীয় উদ্ভিজ্জময় গিরিপাদদেশে নেমে আসে (সমুদ্র সমতলে ২১৩ মিটার উপরে)। এটা হবার কারণ হচ্ছে এই যে পর্বতমালা বায়ুবাহিত আর্দ্রতাকে ধরে রাখে এবং ২০০০ মিটার উচ্চতা অবধি বছরে ৪০০ মিলিমিটার পর্যন্ত অধঃক্ষেপ ঘটায়। বেশ বোঝা যায়, যদি বাৎসরিক

গড় উষ্ণতা কমে যেত তবে নিউজিল্যাণ্ডে একটানা তুষার-সম্পাত হত।

এইভাবে, তুষারসম্পাতের জন্যে কেবল উষ্ণতা কমাই যথেষ্ট নয়, প্রচুর পরিমাণ আর্দ্রতাও দরকার। আর্দ্রতা পাহাড়ে এসে জমা হয় এবং তুষার অধঃক্ষেপ হয়। কার্যত এই অবস্থা কোয়ার্টারনারি পর্যায়ে যেমন, তার আগেও তেমনি হতে পারত গিরি-গঠনের প্রক্রিয়ার ফলে। ফলে বিস্তৃত তুষার-সম্প্রপাত ঘটাতে পারত। এই ধরনের তুষারসম্পাতের চিহ্ন নানান ভূতাত্বিক পর্যায়ে পাওয়া গেছে।

কতকগুলি প্রাক্‌-কোয়ার্টারনারি তুষারসম্পাতের কারণ ব্যাখ্যা করতে না পারার উপরে জোর দিয়ে এই প্রকল্পের প্রতিবাদ করা হয়। এ ধরনের তুষারসম্পাতের ব্যাপার এ-পর্যন্ত মাত্র একটি গোলার্ধে বা একটি দেশে জানা গিয়েছে। অবশ্য একথা বলাও যায় যে প্রাক-কোয়ার্টারনারি তুষার-সম্পাত সম্বন্ধে ভালভাবে বিশ্লেষণ করা হয়নি এবং খুব সম্ভব এগুলি সব জায়গায় আবিষ্কৃত হয়নি।

বিজ্ঞান এখনো তুষারসম্পাতের কারণ পুরোপুরি আবিষ্কার করতে পারেনি। তবু তুষার সম্পাত সম্পর্কে যা কিছু প্রমাণ পাওয়া গেছে তাতে বলা যায় যে ব্যাপারটি বুঝতে এবং প্রাকৃতিক কারণ দিয়ে তা ব্যাখ্যা করতে আমরা প্রায় সক্ষম হয়েছি। চূড়ান্ত গবেষণায় আমরা বিপুল তুষারসম্পাতের কারণ নিশ্চয়ই আবিষ্কার করতে পারব। তার সঙ্গে সঙ্গে কোয়ার্টারনারি পর্যায়ে তুষার সম্পাতের সমস্যার সমাধান

হবে এবং এইভাবে আরেকবার একথা প্রমাণিত হবে যে প্রকৃতিতে অজ্ঞেয় কোনো বস্তু নেই।

পৃথিবীর বয়স কত

মানুষের জীবনকে নানা ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন, শৈশব, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব, বার্ধক্য। কখনো কখনো আমরা আবার বলি 'ঠাকুর্দার আমলে এটা ঘটেছিল'। মানুষের জীবনের কোনো ঘটনাকালকে এই উক্তি দিয়ে বোঝাতে চাই। আবার যখন 'প্রথম পিটারের সময়ে প্রথম খবরের কাগজ বেরিয়েছিল' বা অন্য কিছু বলি, তখনও কোনো দেশ বা মানুষের ইতিহাসের কাল ঐ একইভাবে বোঝাই।

মানব জাতির ইতিহাসকে তেমনি প্রাচীন প্রস্তর বা প্যালিওজয়িক, নব্য প্রস্তর বা নিওলিথিক যুগে এবং ধাতু-যুগে ভাগ করি। আমরা জানি যে বিপুল তুষারসম্পাতের যুগে প্রাচীন প্রস্তর-যুগের মানুষ বেঁচেছিল। বলা যায় যে নিজনিয়ে ভোলঝে-তে বা বৈজ্ঞানিকদের দেওয়া নাম খফালিন্‌স্কিৎ-তে যখন সমুদ্র ছিল তখন প্যালিওলিথিক মানুষ ম্যামথ শিকার করত। এখানে আমরা পৃথিবীর এমন ইতিহাসে চলে আসি, যার বিষয়ে কোনো প্রত্যক্ষদর্শীর লিখিত সাক্ষ্য নেই বা থাকা সম্ভব নয়।

ভূত্বকের একেবারে উপরের স্তর থেকে নীচের স্তর অবধি বিশ্লেষণ করে ভূতাত্ত্বিকগণ পৃথিবীর ইতিহাসের বহু চিত্তাকর্ষক এবং মূল্যবান বিষয় ব্যাখ্যা করেছেন। কতকগুলি অকাট্য

তথ্যের উপরে ভিত্তি করে তাঁরা পৃথিবী এবং তার জীবনের ইতিহাস সম্বন্ধে বস্তুবাদী দর্শন প্রতিষ্ঠা করেছেন। প্রতিষ্ঠা করেছেন প্রাণী এবং উদ্ভিদের ক্রমবিকাশের নিরবচ্ছিন্নতা, সরল থেকে জটিলে, নিম্ন থেকে উচ্চে উদ্বর্তন। এই সব তথ্য থেকে পৃথিবীর সমস্ত ইতিহাসকে পাঁচটি মহাযুগে ভাগ করা গেছে: আর্কেইক্ (প্রাচীনতম), প্রতেরোজয়িক (প্রাথমিক জীবনের কাল), প্যালিওজয়িক (প্রাচীন জীবনের কাল), মেসোজয়িক (মাধ্যমিক জীবনের কাল), এবং কাইনোজয়িক (নব জীবনের কাল)। প্রত্যেকটি মহাযুগকে কতকগুলি পর্যায়ে, পর্যায়কে আবার যুগে এবং শতাব্দীতে ভাগ করা হয়েছে। কিন্তু ভূতাত্ত্বিক শতাব্দী বা পর্যায় মানুষের জীবন বা সাম্রাজ্যের ইতিহাসের, এমন কি সমগ্র মানবজাতির ইতিহাসের শতাব্দী বা পর্যায়ের মত নয়। মিল কেবলমাত্র এক জায়গায়, কোনো একটি বিরাট ঘটনা দিয়ে পর্যায়কে ভাগ করার মধ্যে! অবশ্য শতাব্দী বা পর্যায় সর্বত্র সমান নয়। যেমন, বিপুল তুষারসম্পাত পৃথিবীর ইতিহাসের কোনো পর্যায় নয়, ভূতাত্ত্বিক শতাব্দীমাত্র। আর যেসব ঘটনার কথা আমরা বলেছি—খ্ফালিন্স্কি সমুদ্রের অস্তিত্ব, বিপুল তুষার-সম্পাত, খ্ফালিন্স্কি প্রাণীজগতের অস্তিত্ব—এসব পৃথিবীর ইতিহাসের একটিমাত্র ভূতাত্ত্বিক পর্যায়ের মোটামুটি অর্ধেক, একেবারে সাম্প্রতিক—কোয়ার্টারনারি বা এ্যানথ্রোজেনেটিক অর্থাৎ পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের পর্যায়ের, যে পর্যায়ে আমরা নিজেরাই বাস করছি সেই পর্যায়ের অর্ধেক।

পৃথিবীর ইতিহাসকে বৈজ্ঞানিকগণ মোট এগারোটি ভূতাত্বিক পর্যায়ে ভাগ করেছেন (বইয়ের শেষে দেওয়া তালিকাটি দেখুন)। বোঝা যায় যে পর্যায়ের মধ্যবর্তী সীমা, মহাযুগের মধ্যে যেমন, তেমনি শর্তাধীনভাবে টানা হয়েছে, কারণ পৃথিবী নিজে এবং তার উপরকার জীবনও নিরবচ্ছিন্নভাবেই ক্রমবিকশিত হয়েছে। কিন্তু তবু প্রত্যেকটি পর্যায় পৃথিবীর ইতিহাসের এক একটি বিচ্ছিন্ন অধ্যায়, খণ্ডাংশ। প্রত্যেকটি পর্যায়ে তার পূর্ববর্তী পর্যায় অপেক্ষা নতুন, উন্নত উদ্ভিদ এবং জীবের আবির্ভাব হয়েছে, তার সঙ্গে সঙ্গে আবার পৃথিবীর নিজেরই পরিবর্তন হয়েছে, জল ও স্থলের বিন্যাস, জলবায়ু ইত্যাদি পরিবর্তিত হয়েছে। নতুন প্রকারের প্রাণী এবং উদ্ভিদের আবির্ভাব হবার জন্যে পূর্ববর্তী ভূতাত্বিক পর্যায়ের মানুষ আমাদের পূর্বপুরুষদের দীর্ঘকালব্যাপী পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। এসব প্রমাণ করার জন্যে আমরা জীবাশ্মবিদ্যা থেকে প্রচুর অবিসম্বাদিত তথ্য পাই। কিন্তু, তবু পর্যায়গুলি সম্বন্ধে একথা বলা চলে না যে কত বছর ধরে কোন্ মহাযুগ পর্যায় চলেছিল, কতকাল আগে পৃথিবীতে কোন ঘটনা ঘটেছিল।

কতকাল আগে মানুষ ম্যামথ শিকার করত বা কতদিন আগে বিপুল তুষারসম্পাত ঘটেছিল তা কি জানা সম্ভব? হ্যাঁ, মোটামুটি জানা সম্ভব।

একেবারে প্রাচীন ঐতিহাসিক দলিলে খৃষ্টপূর্ব ৪½—৫ হাজার অর্থাৎ মোট ৬½ হাজার বছর আগে লিখিত পুঁথিপত্রেও

লেখা নেই, কী করে ম্যামথ্ শিকার করা হয়, তা কেউ দেখেছে বা শুনেছে এমন কথাও লেখা নেই। অর্থাৎ তার ঢের আগে ম্যামথ্ শিকার করা হত। আর দেখুন, আমরা জানি যে ম্যামথ্-এর অস্থি-অবশেষ যেসব ভূস্তরে আছে সেগুলি একেবারে সাম্প্রতিক।

কোসার নদী যেখানে সাগরে পড়েছিল তাকে এখন বলা হয় পভোল্‌ঝে। পভোল্‌ঝেতে যখন সমুদ্র ছিল তার পর কতকাল অতিবাহিত হয়েছে?

সাগর শুকিয়ে ডাঙা হবার মত ব্যাপার কত আস্তে আস্তে ঘটে তা বোঝা যায় তামান্‌স্কি উপদ্বীপের (কের্চেন্‌স্কি প্রণালী) ভাঙা খাড়া পাড় দেখলে। এ সব ভাঙা জায়গায় চওড়া কালো কালো স্তর স্পষ্ট দেখা যায়। এগুলি একটু দূরে সাগরে ডুবে গেছে, গেছে জলের ভিতর তলিয়ে। এই সব স্তরের ভিতর রোম এবং গ্রীসদেশীয়দের বহু বাসনপত্রের ভাঙা টুকরো পাওয়া গেছে। খৃষ্টপূর্ব ৪—৩ শতাব্দীতে যারা এখানে থাকত এগুলি তাদেরই অবশেষ। দু'হাজার তিন-চারশ বছর আগে সেখানে সমুদ্রতীর ছিল, লোকের বসতি ছিল। আর এখন জায়গাটা জলের নীচে। এই সাংস্কৃতিক স্তর, এমন কি এরও আগেকার স্তর অন্য নানান জায়গায় দেখা যায়। যেমন দনের মোহানায় আজোব সাগরের উপকূলে, কোল্‌খিদ্-এ (জাকাভ্‌কাজ-এ*), বাল্টিক

* জা-কাভ্‌কাজ অর্থ 'ককেসাস্-উত্তর' বা 'ককেসাসের ওধারের' —অনুবাদক।

সাগরের কাছে। এসব জায়গায় সর্বত্র তীরভূমির পরিবর্তন দেখা যায়।

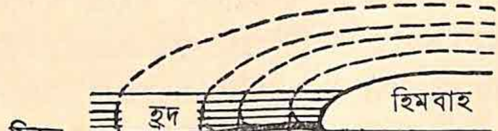
হিসেব করে দেখা গেছে যে তীরভূমি এক শতাব্দীতে ৩—৫ সেন্টিমিটার উঁচু হতে বা ক্ষয়ে যেতে পারে। নিজনিয়ে পভোল্‌ঝে-তে কোসারীয় (বা খ্‌ফালিন্‌) সাগরের তটরেখা প্রথমে কোসার নদীর স্তরের চেয়ে ২০ মিটার উপরে উঠেছিল। পরে আবার ততখানিই নীচে নেমে গিয়েছিল। খুব বেশি বেশি ধরে হিসেব করলেও এর জন্যে প্রায় ১ লক্ষ বছর লেগেছে। এটা তো পৃথিবীর ইতিহাসে তুচ্ছ এক ঘটনা মাত্র।

এইভাবে এক লক্ষ বছরের কম নয়, বরং সর্বশেষ তথ্য অনুসারে তারো বেশি আগে নিম্ন পভোল্‌ঝে-তে কোসার নদীর মুখ ছিল। নদীটি কোসার সাগরে, ভূতাত্ত্বিকেরা বলেন কাস্পিয়ান সাগরে এসে পড়ত। প্রমাণিত হয়েছে যে বিপুল তুষারসম্পাতের সময়ের একেবারে গোড়ার দিকে এটা ঘটেছিল।

অবশ্য বছরের সংখ্যার এই হিসেব খুব যথাযথ নয়। কারণ তটরেখার গতির হার সব সময় এক ছিল না। কখনো গতি থেমে যেত, কখনো উত্থানের বদলে অবনমন হত। এই গতি আরো বেশি দ্রুত কিম্বা ধীরও হতে পারে। কিন্তু তবু এই রকম হিসেব খুব চিত্তাকর্ষক, কারণ পৃথিবীর ইতিহাসের খুব সাম্প্রতিক কাল সম্বন্ধে ভাবতে গেলেও ভূতাত্ত্বিককে যে লক্ষ লক্ষ বছর নিয়ে কাজ করতে হয়, এর থেকে আমরা সে ধারণাটা পাচ্ছি।

পৃথিবীর ইতিহাসের তুষারসম্পাতের যুগ নির্ণয় করার আরো ঢের বেশি যথাযথ এবং বিশ্বাসযোগ্য উপায় আছে। হিমবাহের আবরণ যখন গলছিল তখন তার জলের সঙ্গে প্রচুর বালি, পাথর এবং কাদা রয়ে গিয়েছিল। সেই জল যখন হ্রদ বা সমুদ্রের উপকূলবর্তী অংশে পড়ল তখন বালি থিতিয়ে পড়ল, আর শীতকালে জল যখন জমে বরফ হয়ে গিয়েছিল তখন ঘোলা জলের কাদাও থিতিয়ে পড়েছিল। সমুদ্রের তলদেশে দুটি স্তর হল—একটি বালির স্তর আর একটি কাদার স্তর। এই ব্যাপার প্রত্যেক বছর হত। হিমবাহ যখন একেবারে গলে গেল, আর জল গেল শুকিয়ে তখন তার জায়গায় বালি আর কাদার স্তর রয়ে গেল। হিমবাহ কতগুলি স্তর তৈরি করেছে, তা শুনলেই এবং হিমবাহ কত বছর আগে শেষ হয়েছিল তা জানলেই হিমবাহের শুরু কবে হয়েছিল তা জানা যায়। হিমবাহের তৈরি কাদার নাম 'ফিতে কাদা'। বহু জায়গায় এ-কাদা দেখতে পাওয়া যায় (চিত্র ৩)।

লেনিনগ্রাদের নীচেকার ফিতে কাদা বিশ্লেষণ করার



চিত্র ৩ ॥ ফিতে কাদার গঠন।

পর প্রমাণিত হল যে ১৪০০০ বছর আগেই হিমবাহের প্রান্ত লেনিনগ্রাদের কাছে ছিল।

এই সময়ে মানুষের সঙ্গে ছিল গৃহপালিত পশু (কুকুর, বলগা হরিণ), মানুষ তখন তীর ধনুক বানাতে শিখেছে।

সবচেয়ে নতুন তথ্য অনুসারে ম্যামথ্-এর সর্বশেষ যে নমুনা তা সাইবেরিয়ায় বেঁচে ছিল ; হয়ত লোমশ গণ্ডারও ছিল।

এই উদাহরণ থেকে বোঝা যায়, পৃথিবীর ইতিহাসের একেবারে শেষ দিককার পাতাগুলিও আমাদের থেকে হাজার হাজার বছর দূরে।

কিন্তু আরো প্রাচীন স্তরের বয়স কী করে নির্ণয় করা যায় ?

এটা নির্ণয় করার উপায় খুব কমই আছে। প্রমাণিত হয়েছে যে সীসা তৈরি হয় রাসায়নিক মৌল ইউরেনিয়াম এবং থোরিয়ামের বিয়োজন থেকে। হিসেব করে দেখা গেছে, একশো গ্রাম ইউরেনিয়ামে এক গ্রাম অর্থাৎ শতকরা একভাগ সীসা তৈরি হতে ৯ কোটি বছর দরকার। আর অর্ধেক হবার জন্যে, বা বৈজ্ঞানিক ভাষায়, ইউরেনিয়ামের অধবিয়োজনের জন্যে ৪·৫ মিলিয়ার্ড বছর দরকার। থোরিয়ামের অর্ধবিয়োজনের কাল ১৩·৯ মিলিয়ার্ড বছর। অন্য কয়েকটি মৌলেরও অন্তর্নিহিত ধর্ম তেজস্ক্রিয়তা। তার ভিতরে রুবিডিয়াম্-এর অর্ধবিয়োজন কাল ৬০ মিলিয়ার্ড বছর, আর প্রকৃতিতে বহুবিস্তৃত পটাসিয়ামের অর্ধবিয়োজন কাল ৩০০

কোটি বছর। অবশ্য এই রকমের সমস্ত পদ্ধতিই অত্যন্ত বিরাট বিরাট কাল পরিসর নির্ণয়ে প্রযোজ্য, যে কালকে প্রকাশ করা হয় কোটি কোটি বছর দিয়ে। যেমন রুবিডিয়ামের পদ্ধতিটি ; যে সব ধাতর পদার্থের বয়স, ৫০-১০০ মিলিয়ন বছরের কম নয়, তাদের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি প্রযোজ্য।

অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র কাল পরিসর নির্ণয় করার জন্যে গত কয়েক বছরে নতুন নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে। এক লক্ষ বছরের জন্যে আয়োনীয় পদ্ধতি, রেডিয়াম-ইউরেনিয়াম এবং এ্যাক্টিনিয়াম-রেডিয়াম পদ্ধতি ৩ লক্ষ এবং রেডিয়াম-কার্বন পদ্ধতি ২০ হাজার বছরের জন্যে। সবশেষে সবচেয়ে যথাযথ (ভুল ৪০০ বছরের বেশি হয় না) অথচ অত্যন্ত জটিল এক পদ্ধতি ক্রমাগত ব্যবহৃত হচ্ছে পুরাতত্ত্ব এবং কতকগুলি ভূতাত্ত্বিক গবেষণায়। এর প্রধান সূত্র এই যে উদ্ভিদ বায়ুমণ্ডল থেকে তেজষ্ক্রিয় (C_{14}) এবং সাধারণ (C_{12}) কার্বন শোষণ করে নেয় এবং বায়ুমণ্ডল এবং উদ্ভিদের ভিতরে পারস্পরিক সম্পর্ক এক রকম থাকে। কিন্তু উদ্ভিদ ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে তেজষ্ক্রিয় কার্বন বিয়োজিত হতে থাকে এবং ৫৫৬০ বছরে উদ্ভিদস্থ তেজষ্ক্রিয় কার্বনের শুধুমাত্র অর্ধেক বালি থাকে। ফসিলীভূত উদ্ভিদে তেজষ্ক্রিয় কার্বনের পরিমাণ নির্ণয় করে তার বয়স নির্ণয় করা হয়। এই পদ্ধতিতে কতকগুলি পুরাতাত্ত্বিক বস্তুর বয়স নির্ণয় করা হয়েছিল। সে বয়স অন্যান্য পদ্ধতিতে নির্ণীত বয়সের সঙ্গে চমৎকার মিলে গিয়ে-ছিল। আমাদের দেশে তাইমীরস্কি ম্যামথের সঙ্গে পাওয়া

উদ্ভিদের বয়স দেখে কিছুকাল আগে তার বয়স ১১ হাজার বছর বলে নির্ণীত হয়েছিল। নিশ্চিত উপায়ে বৈজ্ঞানিকেরা প্রমাণ করেছেন যে আর্কেইক্ মহাযুগের সবচেয়ে প্রাচীন ভূস্তর দুই শত কোটি বছরেরও আগে তৈরি হয়েছে।

এই স্তরগুলির মধ্যে জীবনের কোনো চিহ্নই প্রায় পাওয়া যায়নি। কিন্তু, সম্ভবত, জীবন ছিল না বলে যে পাওয়া যায়নি তা নয়, স্তরগুলি সৃষ্ট হবার পরে বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গিয়েছে বলেই হয়ত এটা হয়েছে।

পৃথিবীর উৎপত্তি দূর অতীতে হয়েছে।

তারপর বহু কোটি বছর অতীত হল, সৃষ্টির প্রথম সমুদ্রগুলিতে প্রথম প্রাণীগুলি আবির্ভূত হল। প্রথম প্রাণী হচ্ছে অর্ধতরল সব বিন্দু—জেলির মত দেখতে (সমুদ্রের জল তখন ছিল মিষ্টি)। আরো কোটি কোটি বছর চলে গেল, সেই সময়ে জেলির মত ফোঁটাগুলি পৃথিবীর বর্তমান অধিবাসীদের সূত্রপাত করল—করল জন্তুজানোয়ার, উদ্ভিদ আর মানুষের সূচনা।

পৃথিবীর যুগ-পর্যায় নির্ণয় করার আরো অনেক পদ্ধতি আছে। সব পদ্ধতি দিয়েই দেখা যায়, আমাদের গ্রহের বয়স বহু শত কোটি বছর।

স্থল এবং জলভাগের রূপান্তর, প্রাণী এবং উদ্ভিদের এক রূপ থেকে অন্য রূপে পরিবর্তন প্রকৃতিতে অত্যন্ত ধীরগতিতে হয়। এত ধীরে হয় যে এক বা বহু মানুষের জীবন তো দূরের কথা, সারা সভ্যতার সময় কালই এ পরিবর্তনের পক্ষে

অপর্যাপ্ত। এই জন্যে আমরা পৃথিবীর চেহারার পরিবর্তন সরাসরি দেখতে পাই না।

উড়ন্ত তীর কি ভাবে ছোটে দেখার জন্যে ৫-১০ সেকেণ্ড সময় দরকার, ঘাস কি ভাবে বাড়ে দেখার জন্যে ২—৩ দিন দরকার, আর সমুদ্র ও স্থলভাগের লক্ষ্যণীয় কোনো পরিবর্তন দেখতে গেলে লাগে হাজার হাজার বছর (বিশেষ কোনো যন্ত্র যদি ব্যবহার করা না হয়)। কোটি কোটি বছর দরকার পৃথিবীতে জীবনের আবির্ভাব এবং সরলতম জৈব-ব্যবস্থা (Organism) থেকে মানুষ পর্যন্ত ক্রমবিকাশ দেখতে হলে।

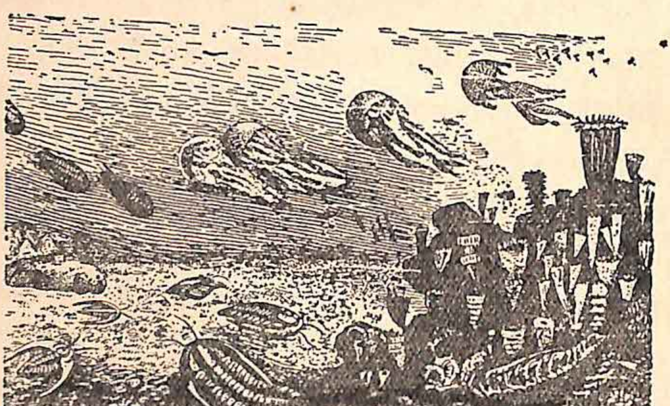
মানুষের জীবনকাল পৃথিরীর ইতিহাসের ঘড়ির এক সেকেণ্ডের ভগ্নাংশবিশেষ। এইজন্যে আমাদের মনে হয়, জল এবং স্থলভাগ পালটায় না, পালটায় না উদ্ভিদ আর মানুষ।

আর্কেইক এবং প্রোতেরোজয়িক মহাযুগ

আর্কেইক মহাযুগ থেকে আমরা ২১০ কোটি বছর সময়ের ব্যবধানে আছি। এই মহাযুগের প্রাচীনতম স্তরগুলিতে জৈব পদার্থের চিহ্ন পাওয়া যায় নি। কিন্তু নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে সজীব পদার্থ তখন ছিল না, কারণ আর্কেইক মহাযুগের উপরকার স্তরগুলিতে সরলতম জলজ উদ্ভিদ এবং অন্যান্য সরলতম মেরুদণ্ডহীন সামুদ্রিক প্রাণীর অবশেষ পাওয়া গেছে। এগুলি ৬০ কোটি বছর আগেকার।

সমুদ্রজাত সজীব পদার্থ এবং উদ্ভিদ তখনো ডাঙায় আসেনি, জলেই তাদের ক্রমবিকাশ হচ্ছিল। ডাঙায় তখন একটা পাতাও ছিল না, ছিল না একটা ঘাসও! মৃত্যুর নিস্তব্ধতা বিরাজ করছিল সর্বত্র। সমুদ্রেই কেবল জীবন ছিল। কিন্তু কেমন সে জীবন? কাঁকড়া, শ্যাওলা, আমাদের জেলিফিসের পূর্বপুরুষ···এরাই ছিল তখন পৃথিবীর অধিকর্তা, এরাই আজকালকার জন্তুজানোয়ারদের পূর্বপুরুষ।

আর্কেইক মহাযুগ মোটামুটি ৯৮ কোটি বছর ধরে চলেছিল, আর প্রোতেরোজয়িক মহাযুগ ছিল ৬০ কোটি বছর ধরে।



চিত্র ৪॥ ৫০ কোটি বছর আগেকার কেম্ব্রিয়ান সাগরের জীব (ত্রিলেবিত্, জেলিফিস্ ইত্যাদি)।

প্যালিওজয়িক মহাযুগ

প্যালিওজয়িক মহাযুগকে পাঁচটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়ঃ কেম্ব্রিয়ান, সিলুরিয়ান্, দেভোনিয়ান্, কার্বনিফেরাস এবং পার্মিয়ান্।

প্যালিওজয়িক মহাযুগের প্রারম্ভে জল এবং স্থলের বিন্যাস আজকালকার বিন্যাসের চেয়ে একেবারে আলাদা ছিল। আর্কেইক এবং প্রোতেরোজয়িক মহাযুগের ১৫০ কোটি বছর অতিবাহিত হবার পরে কেম্বিয়ান্ পর্যায়ের শেষভাগে ন্যস্ত স্তরগুলিতে আমরা পৃথিবীতে বেশ বিভিন্ন রকমের এবং বহু সংখ্যক প্রাণীর সন্ধান পাই।

এই সময়ে সমস্ত জীবন, আগের মত কেবল সাগরেই কেন্দ্রীভূত। কিন্তু ত্রিলোবিতের সংখ্যা অত্যন্ত বেড়ে উঠেছে। এদের আকৃতি ৩ থেকে ৭০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত। আজকালকার ডেঁয়ো পিঁপড়ের মত দেখতে সামুদ্রিক পোকা এবং অন্যান্য নানান অস্থিহীন জীবের মত। উত্তর আমেরিকায় এগুলির যেসব চমৎকার অবশেষ রয়েছে তার থেকে আমরা ৫০ কোটি বছর পরেও এদের ভালভাবে অনুশীলন করতে পারি।

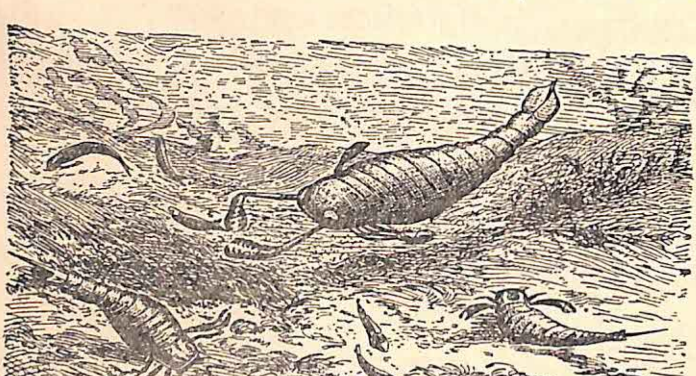
৪নং চিত্রে তখনকার প্রাণী-জগৎকে রূপায়িত করা হয়েছে।

এদের মধ্যে প্রথম মেরুদণ্ডী প্রাণী টেস্টেসাস্ মাছ দেখা দিয়েছে। এদের আকার ৩০ থেকে ৬০ সেন্টিমিটার। এদের শরীরে সংনম্য হাড়ের কঙ্কাল ছিল না। তার বদলে এরা

একটি নিশ্চল খোলসের ভিতরে মাথাশুদ্ধ আবদ্ধ ছিল। খোলস এদের আঘাত থেকে রক্ষা করত। ফলে এদের চলতে ফিরতে কষ্ট হত। অধিকাংশ সময় এরা সমুদ্রের নীচে শুয়ে থাকত।

কেম্‌ব্রিয়ান্ প্রাণীর প্রাধান্য ৮ কোটি বছর ধরে চলেছিল। এই সময়ে তাদের মধ্যে অনেক পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল। কতকগুলি বিছে কাঁকড়া (চিত্র ৫) তখন বেশ বড় আকারের হয়েছে। যেমন তিন মিটার লম্বা তেরিগোতুস্ এত ভাল শিকারী ছিল যে তখন মানুষ থাকলে তাদের হাতে নাজেহাল হতে হত।

সিলুরিয়ান পর্যায়ের পরে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটল।



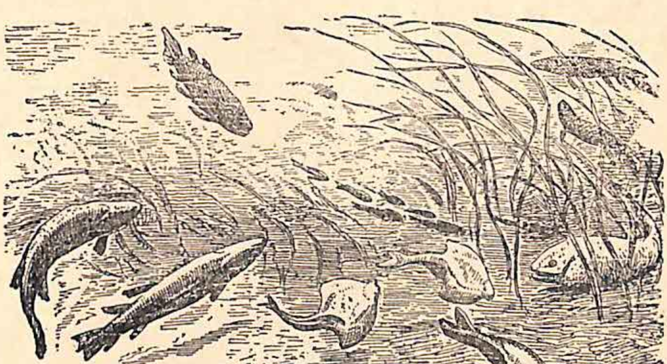
চিত্র ৫ ॥ তিন মিটার লম্বা বিছে-কাঁকড়া—সামুদ্রিক শিকারী প্রাণী —সিলুরিয়ান সাগরের তলায়।

প্রথম মেরুদণ্ডী প্রাণীগুলি স্থলবর্তী জীবনে অভ্যস্ত হতে শুরু করল।

কেম্‌ব্রিয়ান্ পর্যায়ের মত, সিলুরিয়ান পর্যায় অনেককাল ধরে চলেছিল। ১০ কোটি বছরের বেশিকাল যাবৎ মেরুদণ্ডী প্রাণীদের প্রাধান্য চলছিল।

তারপরে আবির্ভাব হল দেভোনিয়ান পর্যায়ের। এটাকে মাছের প্রাধান্যের পর্যায় বলা যেতে পারে। মাছের আকৃতি তখন নানান ধরনের হয়েছে।

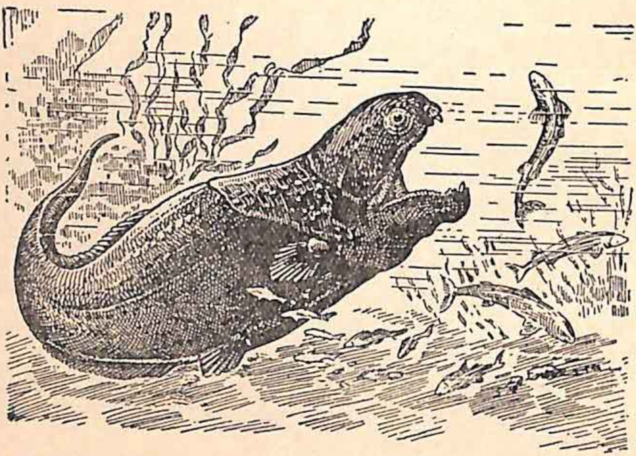
টেস্‌টেসাস্ মাছের জীবনের প্রত্যুষকাল তখন। প্রথমে তারা দেখতে ছিল মধ্যযুগীয় নাইটদের মত, জবড়জং, নড়াচড়া করতে পারত না বেশি। কিন্তু ক্রমে ক্রমে রণসজ্জা কমে



চিত্র ৬॥ টেস্‌টেমাস্ মাছ। দেভোনিয়ান পর্যায়ে রুশ সমভূমির বিপুল এক অংশ-পরিপ্লাবনকারী সমুদ্রে বাস করত।

গেল। খোলস ছোট হয়ে এল, শরীরের কেবল আর্ধেকটা থাকল খোলসের আড়ালে। এতে লেজ নেড়ে চেড়ে চলাফেরা করা সম্ভবপর হল। আক্রমণ করা এবং আক্রমণ প্রতিরোধের ক্ষমতা এতে বেড়ে গেল (চিত্র ৬)। কতকগুলি টেস্‌টেসাস্ মাছের আকার হল বিশাল। এইরকম 'ভয়াল মাছ' ছিল দশ মিটার লম্বা দিনিক্‌তিস্ (চিত্র ৭) আর তার চেয়েও বড় তিতানিক্‌তিস্। এই হিংস্র মাছগুলির দাঁত ছিল না, কিন্তু হাড়ের তৈরি এমন ধারালো চোয়াল ছিল যে তারা অতি সহজেই দু একটা মানুষ কেটে ফেলতে পারত।

সজীব পদার্থ ডাঙায় বসবাস করতে থাকল। প্রাথমিক কীটের আবির্ভাব হল। কতকগুলি মাছ স্থলজীবনে



চিত্র ৭॥ ন মিটার লম্বা টেস্‌টেসাস্ মাছ দিনিক্‌তিস্। দেভোনিয়ান পর্যায়ে বেঁচেছিল। চিত্রে তাকে হাঙ্গর শিকার করতে দেখা যাচ্ছে।

নিশ্চিতভাবে অভ্যস্ত হয়ে গেল এবং আমাদের পরিচিত প্রথম স্থলচর মেরুদণ্ডী প্রাণী—স্তেগোৎসেফাল্ দেখা দিল।

দেভোনিয়ান্ পর্যায়ের শেষে ফার্ণ, হর্সটেল্ এবং আজকালকার উদ্ভিদের মত দেখতে অন্যান্য উদ্ভিদ দেখা দিল। পৃথিবীর উদ্ভিজ্জ আবরণ ঘন হতে লাগল। এই সময়ে বৃক্ষতুল্য উদ্ভিদও দেখা দিল, যা আগে ছিল না।

দেভোনিয়ান্ পর্যায় সাড়ে ৫ কোটি বছর স্থায়ী হয়েছিল এবং স্থলভাগ প্রাণী এবং উদ্ভিদে ছেয়ে গেলে সে-পর্যায় শেষ হয়ে গেল।

পৃথিবীর ইতিহাসের এক নতুন পাতা খুলল, প্রাচীন উদ্ভিজ্জের সাড়ম্বর অভিযান শুরু হল। এরই ফলে পাথুরে কয়লার সবচেয়ে বড় অবক্ষেপ তৈরি হয়েছে। তাই এই পর্যায়কে বলা হয় কার্বনিফেরাস্ পর্যায় (চিত্র ৮)।

উদ্ভিদজগৎ বিচিত্র রূপময় হতে শুরু করল। উদ্ভিদ পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়তে লাগল, বিভিন্ন জলবায়ুতে অভ্যস্ত হতে লাগল, গ্রীষ্মপ্রধান দেশ থেকে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল পর্যন্ত।

বনজঙ্গল নানা ধরনের পোকায় ছেয়ে গেল, মাকড়সা-মার্কা পোকা, আরশোলা, একদিন বাঁচা পোকা ইত্যাদি ইত্যাদি। বর্তমানে বৈজ্ঞানিকেরা কার্বনিফেরাস পর্যায়ের কয়েক হাজার পোকার বিষয় জানতে পেরেছেন।

নদী ও হ্রদের উপরে, ঘন ঝোপের মধ্যে, পাখিদের সঙ্গে বিরাট বিরাট সব ফড়িং উড়ত। এদের দু'পাখনার ডগার

ভিতরে ফারাক ছিল ৭০ সেন্টিমিটার বা তারও বেশি (বৈজ্ঞানিকেরা একটি ফড়িং খুঁজে পেয়েছেন, তার ছু'পাখনার ডগার মধ্যে তফাত ১ মিটার)। কাঁকড়াবিছে, এবং উভচর প্রাণী অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছিল। তাদের ছু'একটাকে দেখলে আমাদের য়াস-সাপের কথা মনে পড়ে, আর কয়েকটি দেখলে মনে পড়ে পেল্লায় পেল্লায় টিকটিকির কথা, লম্বায় ছিল তারা আধ মিটার অবধি।

কার্বনিফেরাস পর্যায়ে লক্ষ্যণীয় একটা ঘটনা ঘটেছিল— প্রারম্ভিক সরীসৃপের (শ্বাপদ জন্তু) আবির্ভাব হয়েছিল। এগুলো ডাঙায় ডিম পাড়ত। উভচর প্রাণীদের মত, অর্থাৎ তখনকার অন্যান্য প্রাণীদের মত সরীসৃপের রক্ত ছিল শীতল এবং বাঁচত কেবল উষ্ণ জলবায়ুতে।



চিত্র ৮ ॥ কার্বনিফেরাস্ পর্যায়ের বন। চার মিটার লম্বা স্থলচর প্রাণী এওহিপ্‌পাসকে দেখা যাচ্ছে।

পৃথিবীর ইতিহাসে সরীসৃপের আবির্ভাব সবচেয়ে প্রধান ঘটনা। পৃথিবীর ওপর আধিপত্য বিস্তারে মেরুদণ্ডী প্রাণীদের প্রধানতম পদক্ষেপ এটি। বহু কোটি বছর যাবৎ পৃথিবীর আধিপত্য তাদেরই হাতে ছিল। উষ্ণ-রক্তবান প্রাণীর আবির্ভাব হওয়া পর্যন্ত তাদের আধিপত্য বজায় থাকল। উষ্ণ-রক্তবান স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং পাখি স্থল এবং আকাশের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত অধিকার করে ফেলল।

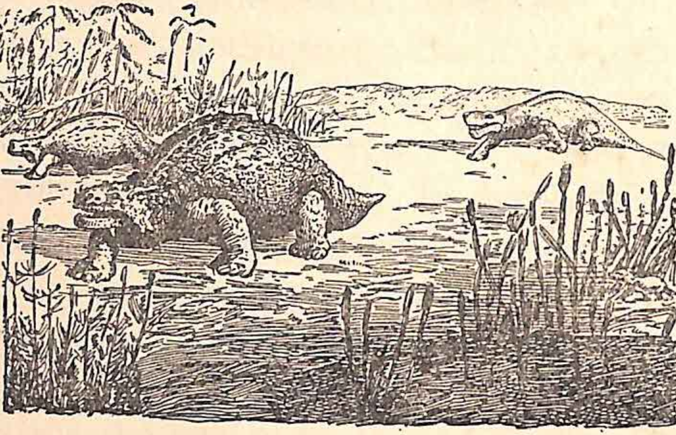
এক সময় সরীসৃপের সঙ্গে প্রারম্ভিক স্থলচর শামুক-মার্কা হাড়ছাড়া প্রাণীর আবির্ভাব হল।

কার্বনিফেরাস পর্যায় সাড়ে ৫ কোটি বছর স্থায়ী হয়েছিল।

আড়াই কোটি বছর ধরে, অর্থাৎ প্যালিওজয়িক মহাযুগের সবশেষের পর্যায় পার্‌মিয়ান পর্যায় পর্যন্ত উদ্ভিদ এবং প্রাণী স্থলে আধিপত্য বিস্তার করে চলল।

এই সময়ে তৃণভোজী এবং মাংসাশী সরীসৃপ বহু প্রকারের হয়ে পড়েছে। এরা থাকত নদী এবং হ্রদের ধারে ধারে। এখানে জলাভূমির গাছপালার ভিতরে ওরা খাবার পেত। আর মাঝে মাঝে নিজেরাই শিকারী প্রাণীর খাদ্য হয়ে পড়ত। এদের একটি ছিল পারেইওসেরাস্‌, লম্বায় তিন মিটার পর্যন্ত হত। এরা আস্তে আস্তে এক জমি থেকে অন্য জমিতে যেতে পারত (চিত্র ৯)।

এই সময়ে সরীসৃপদের মধ্যে প্রচুর শিকারী ছিল। কিছু সরীসৃপ বেশ চলতে ফিরতে পারত। যেমন, ইনোস্ত্রান্‌ৎসেভিয়া। কিছু সরীসৃপের আবার চলতে ফিরতে



চিত্র ৯ ॥ পারমিয়ান যুগের সরীসৃপ।

অসুবিধে হত। শেষ দিকে দিমেত্রোদন-এর আবির্ভাব হয়েছিল। এই বিশিষ্ট প্রাণীটি পারমিয়ান্ পর্যায়ের গোড়ার দিকে বেঁচে ছিল। এরা লম্বায় তু'মিটার পর্যন্ত হত। এদের শিরদাঁড়া-বরাবর একটা চিরুনির মত প্রত্যঙ্গ ছিল। এই চিরুনির দাঁত ৭০-৮০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত উঁচু হত, আর মোটা হত আঙুলের মত। দাঁতগুলি সম্ভবত চামড়া দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে মোড়া ছিল।

পারমিয়ান পর্যায়ে সামুদ্রিক প্রাণীর (কার্বনিফেরাস্ পর্যায়ের তুলনায়) খুব কমই পরিবর্তন হয়েছিল। ত্রিলোবিত-এর অনেক শ্রেণী বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

কীটের মধ্যে প্রারম্ভিক যা অর্থাৎ গুবরে পোকার জন্ম হয়েছিল।

উদ্ভিদের বেশ পরিবর্তন হয়েছিল। পৃথিবীতে প্রথম সরলবর্গীয় বৃক্ষের উদ্ভব হল। বৃক্ষতুল্য হর্স-টেল্ এবং লাইকো-পোডিয়াম্ মরে গেল।

জলবায়ু শুষ্ক হয়ে উঠল।

পারমিয়ান পর্যায়ের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর ইতিহাসের দ্বিতীয় মহাযুগ—প্যালিওজয়িক মহাযুগ শেষ হয়ে গেল। এই মহাযুগ মেরুদণ্ডহীন প্রাণীর আধিপত্যের কাল এবং মেরুদণ্ডী প্রাণীর আবির্ভাবের কাল, যারা স্থলচর জীবনে প্রথমে অভিযান চালিয়েছে। প্যালিওজয়িক মহাযুগে উদ্ভিদ সম্পূর্ণরূপে স্থলভাগ অধিকার করে ফেলেছিল।

প্যালিওজয়িক মহাযুগের শেষ এবং তার পরবর্তী মেসোজয়িক মহাযুগ থেকে আমাদের মধ্যে ব্যবধান প্রায় ২০ কোটি বছরের।

মেসোজয়িক মহাযুগ

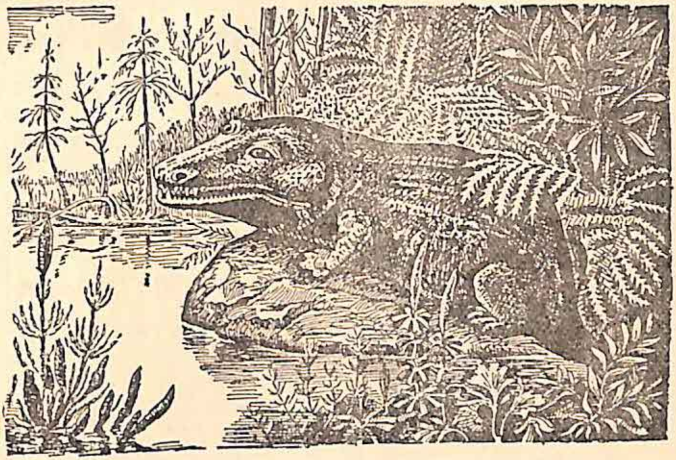
মেসোজয়িক মহাযুগের প্রারম্ভে ভৌগোলিক মানচিত্র আজকালকার মত হয়ে উঠতে পারেনি। এই মহাযুগ হচ্ছে স্থলচর সরীসৃপের আধিপত্যের কাল। এদের আকার বিশাল, ২৫—৩০ মিটার পর্যন্ত, ওজন পঞ্চাশ টন অবধি। এই যুগে আকাশের অধিকর্তা উড়ন্ত সরীসৃপ (প্যাঙ্গোলিন) এবং পাখির আবির্ভাব হয়েছিল। আবির্ভাব হয়েছিল উষ্ণ রক্তবান প্রাণীর—স্তন্যপায়ীদের।

১২৫ মিলিয়ার্ড বছর ধরে মেসোজয়িক মহাযুগ চলেছিল।

একে আবার তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়, ত্রিয়াসিক, জুরাসিক এবং ক্রেটেসাস্।

মেসোজয়িক মহাযুগের সবচেয়ে নীচের স্তরগুলি ত্রিয়াসিক পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। এগুলির ভিতরে স্তন্যপায়ী প্রাণীর অবশেষ পাওয়া যায়। পরবর্তী পর্যায়ের (কাইনোজয়িক) প্রথম থেকে এরা পৃথিবীর আবাসিক প্রাণীদের মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করে বসেছিল এবং বর্তমানকাল অবধি তাই করে আসছে। বর্তমানকালের সমস্ত মেরুদণ্ডী প্রাণী স্তন্যপায়ীদের পর্যায়ে পড়ে। এদের রক্ত উষ্ণ (পাখি ছাড়া আর সবার মতো)। মানুষও এদের অন্তর্গত। প্রারম্ভিক স্তন্যপায়ী প্রাণীগুলি আকারে ধেড়ে ইঁদুরের মত ছিল। এগুলি দাঁতাল শ্বাপদের (তেরিওদন্) থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের কয়েকটি পর্যায়ের কোন বংশধর থাকেনি। উন্নত প্রাণীগুলির সমস্ত পর্যায় অন্যগুলির (পান্তথেরিয়াম) থেকে ক্রমবিকশিত হয়ে উঠেছে। পরে এগুলি সারা পৃথিবীতে আবাস স্থাপন করেছে। স্তন্যপায়ী শ্রেণীর সবচেয়ে প্রাচীন প্রতিভূগুলি উপগ্রীষ্ম এবং নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের আর্দ্র বনে বনে গাছের উপর বাস করত।

ত্রিয়াসিক পর্যায়ে সমস্ত প্রকার পরিচিত সরীসৃপের আবির্ভাব হয়েছে। এই সময়ে প্রথম কুমির এবং মেছো-কুমিরের উদ্ভব। সঙ্গে সঙ্গে উভচর প্রাণী আরো বিস্তৃত হয়ে পড়ে। এদের কতকগুলি বিরাট আকারের ছিল, যেমন মাস্তোদনোসেরাস্-এর মাথাই ছিল তিন মিটার লম্বা (চিত্র ১০)।



চিত্র ১০ ॥ মাস্তোদনোসেরাস্।



চিত্র ১১ ॥ দু'পায়ে হাঁটা ডাইনোসরাস্।

এখনকার স্থলচর সরীসৃপগুলি তখন বহু সংখ্যক এবং বিভিন্ন প্রকারের ছিল। এদের ভিতরে লক্ষ্যণীয় হচ্ছে ডাইনোসরাস্, যারা হাঁটত হু'পায়ে (চিত্র ১১), শিকার ধরত সামনের হু'পা দিয়ে। সামনের পা হুটি অত্যন্ত ছোট ছিল এবং চলাফেরা করার অঙ্গ হিসেবে এগুলিকে ব্যবহার করা যেত না। সম্ভবত, ত্রিয়াসিক পর্যায়ে শ্বাপদকূলের ছোট একটি শাখা থেকে প্রথম পাখির উৎপত্তি। শ্বাপদের সঙ্গে পাখির গঠন প্রায় মিলে যায়, বিশেষ মিল দেখা যায় ডাইনোসরাসের গঠনের সঙ্গে।

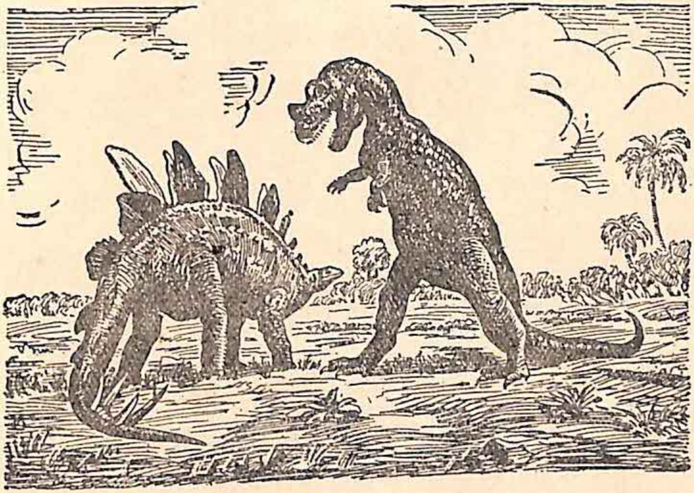
কীটের ভিতর থেকে বহু গুবরে পোকার সৃষ্টি হয়।

এই পর্যায়ে সমুদ্রে প্রারম্ভিক সরীসৃপের উদ্ভব হয়েছে, এদের নাম ইক্তিওসরাস্। উদ্ভূত হয়েছে প্লেজিওসরাস, যাদের পূর্বপুরুষ ছিল স্থলচর সরীসৃপ। এরা ক্রমে ক্রমে জলজীবনে অভ্যস্ত হয়ে গেল এবং সামুদ্রিক প্রাণী বনে গেল।

ত্রিয়াসিক পর্যায় ৩ কোটি বছর ধরে চলেছিল। এর শেষে প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে কম অভ্যস্ত বহু উভচর প্রাণী—স্তোগোৎসেফাল এবং অন্যান্য কতকগুলি সরীসৃপ (তেরিওদন) বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু অন্য বহু সরীসৃপ আবার উল্লেখযোগ্যভাবে বিকাশ লাভ করেছিল পরবর্তী জুরাসিক পর্যায়ে।

জুরাসিক পর্যায় প্রায় আড়াই কোটি বছর ধরে চলেছিল এবং সরীসৃপেরা আকাশকে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করে ফেলেছিল। এদের ভিতরে বুকে হাঁটা, হু'পায়ে ছোটা,

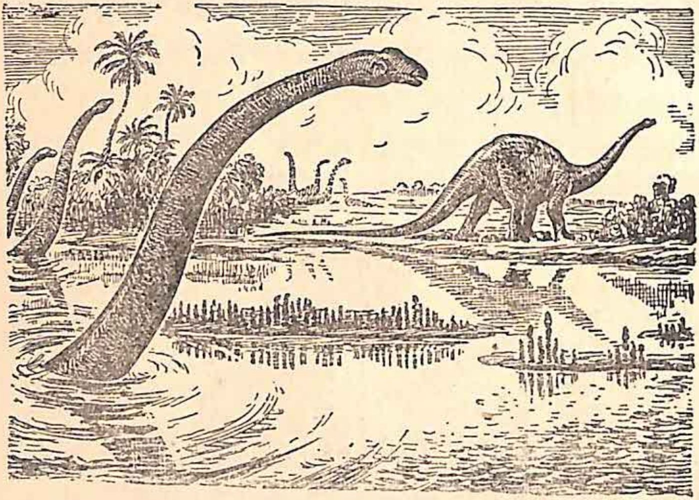
সাঁতারু (সামুদ্রিক) এবং উড়ন্ত সরীসৃপ ছিল। কতকগুলি ছিল নিরীহ গুল্মভোজী, কতকগুলি ছিল হিংস্র মাংসাশী (চিত্র ১২)।



চিত্র ১২ ॥ শিকারী সেরাতোসেরাস্ তৃণভোজী প্রাণী স্তেগোসেরাস্‌কে আক্রমণ করছে।

ডাইনোসরাসদের মধ্যে ছোট ছোট মুরগির মত প্রাণী যেমন ছিল তেমনি দিপ্লোদকের মত বিশালকায় প্রাণীও ছিল (চিত্র ১৩)। দিপ্লোদক লম্বায় ২৫—৩০ মিটার হত, ওজন হত ২৫ থেকে ৬০ টন। জীবনের অধিকাংশ সময়ই এরা স্বল্পবারি হ্রদ এবং উপসাগরে কাটিয়ে দিত।

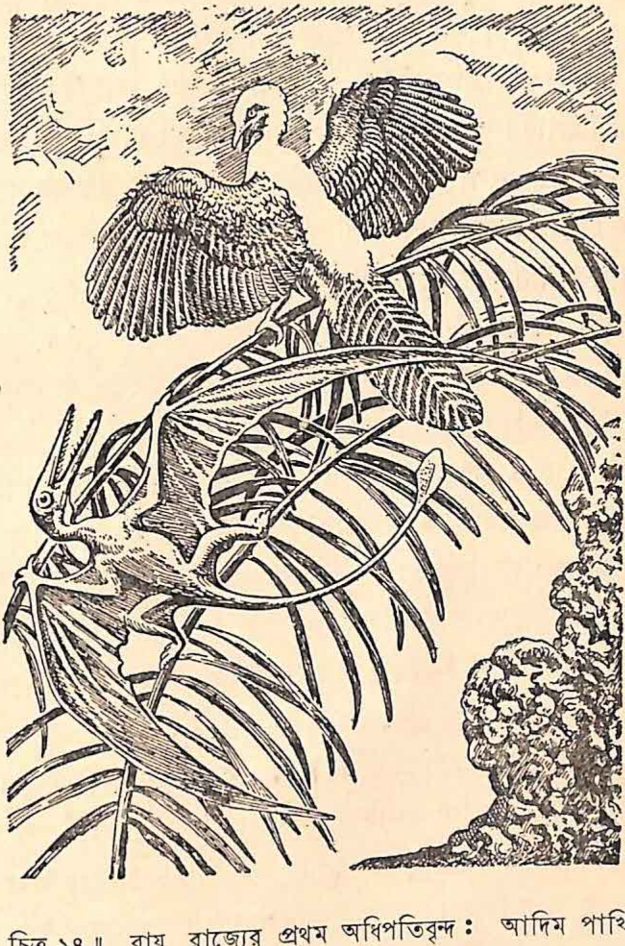
উড়ন্ত প্যাঙ্গোলিনের মধ্যে লক্ষ্যণীয় ছিল ছোট ছোট,



চিত্র ১৩॥ অতিকায় দিপ্লোদক।

সপুচ্ছ, সদন্ত রামফোরিন্‌কুসগুলি (চিত্র ১৪, নীচে) এবং পুচ্ছহীন তেরোদাক্‌তিল। বায়ুরাজ্যে এদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করত পায়রার আকারের আদিম-পাখি—আর্কেওপ্‌তেরিক্‌স (চিত্র ১৪, উপরে)।

সমুদ্রে আধিপত্য বিস্তার করেছিল বিরাট বিরাট মেছো-প্যাঙ্গোলিন—ইক্‌তিওসেরাস (চিত্র ১৫) এবং প্লেজিওসেরাস। বহু-বংশধর বিশিষ্ট এই সামুদ্রিক প্রাণী বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এদের দেখলে আজকালকার কাট্‌ল্ মাছের কথা মনে পড়ে যায়। এদের নাম বেলেম্‌নিত। এদের প্রচুর অবশেষ রয়ে গেছে। 'ডাইনির আঙুল' নামে এরা সুপরিচিত।



চিত্র ১৪ ॥ বায়ু রাজ্যের প্রথম অধিপতিবৃন্দ : আদিম পাখি—আর্কেওতেরিকস্ (উপরে) এবং সপুচ্ছ উড়ন্ত প্যাঙ্গোলিন—রামফোরিনকুস্ (নীচে)।

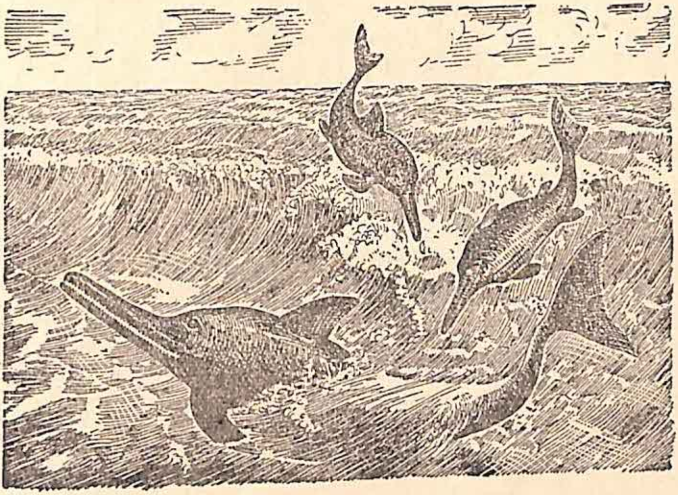
এই সময়েই সামুদ্রিক কুমির এবং কচ্ছপ আবির্ভূত হয়েছে স্থলচর পূর্বপুরুষদের থেকে ক্রমবিকশিত হয়ে।

সামুদ্রিক মেরুদণ্ডহীন প্রাণীগুলি উষ্ণ সাগরগুলিতে সন্তানোৎপাদন করত। তাদের গঠন বহু-বিচিত্র হতে লাগল। ধীরগতি রূপান্তরণের জন্যে প্রাণী জগতে, বিশেষ করে করে উদ্ভিদ জগতে যখন পরিবর্তন দেখা যেতে লাগল তখন জুরাসিক পর্যায় শেষ হয়ে গেল।

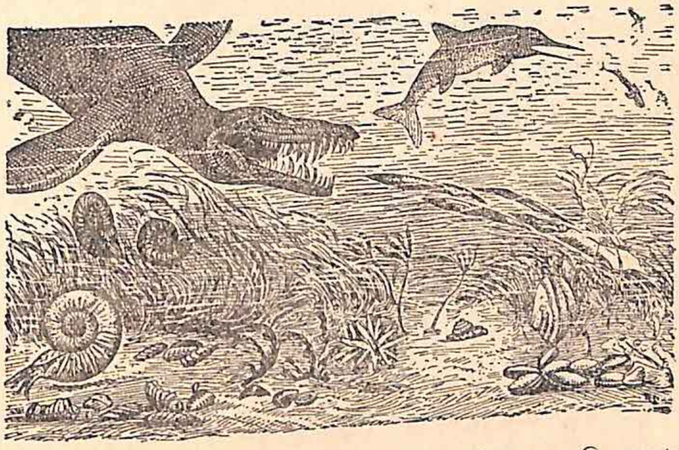
পৃথিবীর ইতিহাসে নতুন এক অধ্যায় শুরু হল। এই সময়ে সমুদ্রে বিপুল বেধসম্পন্ন খড়িমাটির স্তর উৎপন্ন হয়েছিল। সেই জন্য এই পর্যায়কে ক্রেটেসাস্ পর্যায় বলা হয়। এটি কয়েক কোটি বছর ধরে চলেছিল। এই পর্যায়ের একেবারে নীচের দিককার স্তর সমকালীন পাইন এবং সীডার গাছের পূর্বপুরুষদের পাওয়া গেছে। এ-ধরনের অবশেষ অল্প কিছুকাল আগে উরালে পাওয়া গেছে।

প্রায় ১০ কোটি বছর আগে পৃথিবীতে সর্বপ্রথম বৃক্ষের উৎপত্তি হল।

ক্রেটেসাস্ পর্যায়ের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ওক্, বীচ্, বার্চ, ম্যাগ্নোলিয়া, লরেল, প্ল্যাটান ইত্যাদি গাছ দেখা দিয়েছে। পৃথিবীর উদ্ভিজ্জ ক্রমেই সমকালীন উষ্ণ দেশজ উদ্ভিজ্জের মতো হতে শুরু করেছে। কিন্তু ক্রেটেসাস্ পর্যায়ের বনে জঙ্গলে, সমুদ্রে এবং নদীজাত উদ্ভিদের ঘন বনময় হ্রদের ধারে, বালিয়াড়িতে, রৌদ্রদগ্ধ, মরুপ্রায় বালুকাময় অঞ্চলে তখনো দানবাকৃতি সরীসৃপের আধিপত্য চলছে। এই সময়ে স্বল্পভোজী



চিত্র ১৫ ॥ মেছো-প্যাঙ্গোলিন—ইক্‌তিওসেরাস্।

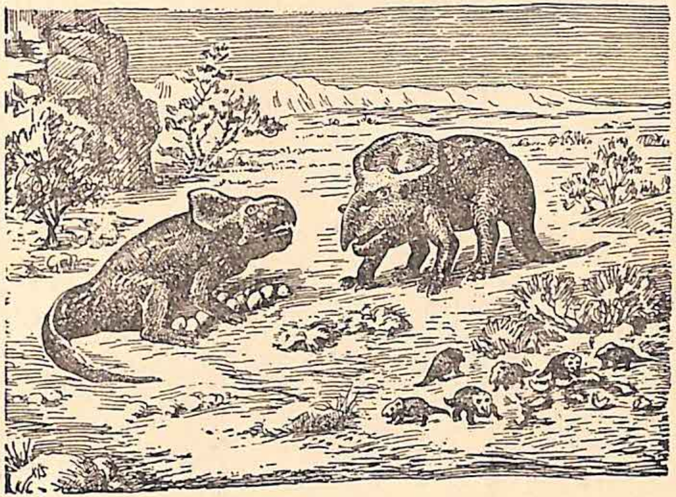


চিত্র ১৬ ॥ জুরাসিক সমুদ্রের তলদেশ। অতিকায় প্লেজিওসেরাস্ বেলেম্‌নিয়ের ঝাঁককে তাড়া করছে।

গণ্ডারাকৃতি ডাইনোসরাস বহু প্রকারের হয়েছে (এদের একটিকে দেখতে ছিল হিংস্র; কিন্তু আসলে সেটি নিরীহ। এটির ছবি মলাটে দেওয়া হয়েছে)। হংসনাস ডাইনোসরাস্-এর শ্রেণীটি ছিল অদ্ভুত। এটি কীটভোজী, দেখতে ডানাকাটা পাখির মত, দ্রুত ছুটতে এবং লাফাতেও পারত। এর নাম অর্নিথোমিদ্ (পক্ষী-অনুকারক) [মলাটের ছবি দেখুন]। হংসনাস ডাইনোসরাসগুলি ছিল বিরাটকায়, লম্বায় দশ মিটার পর্যন্ত। সমতল একটি খোলস ছিল এর। চোয়ালের সামনের অংশে দাঁত ছিল না। কিন্তু পরে 'ঠোঁটের' পিছনে দাঁতের সংখ্যা ছিল দু'হাজার পর্যন্ত। এগুলি চলত দু'পায়ে, মোটা ও অপেক্ষাকৃত ছোট ল্যাজে ভর দিয়ে। সামনের পা দুটি ছিল একেবারে ছোট এবং সম্ভবত তা জীবটিকে সাঁতার কাটায় সাহায্য করত, কারণ তাদের আঙুলগুলো ছিল চামড়া দিয়ে জোড়া। হংসনাস ডাইনোসরাস্‌গুলি জলচর এবং স্থলচর জীবনে অভ্যস্ত ছিল।

ক্রেটেসাস্ পর্যায়ে অন্য সব তৃণভোজী ডাইনোসরাস্‌ও সংখ্যায় অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান আকাদেমির জীবাশ্মবিদ্যাবিষয়ক অভিযাত্রীদল ক্রেটেসাস্ পর্যায়ের ডাইনোসরাসদের এক উল্লেখযোগ্য অবশেষ আবিষ্কার করেছেন (চিত্র ১৭)। মস্কোর বিজ্ঞান আকাদেমির জীবাশ্মবিদ্যার যাদুঘরে এর এক অংশ রক্ষিত আছে।

সত্যিকার পাখিও তখন দেখা দিয়েছে, হেস্‌পেরোর্নিস্,



চিত্র ১৭ ॥ দিনোসেরাস। এদের অস্থি-অবশেষ এবং ফসিলীভূত ডিম ক্রেটেসাস্ পর্যায়ের স্তরে, মঙ্গোলিয়ায় পাওয়া গেছে।

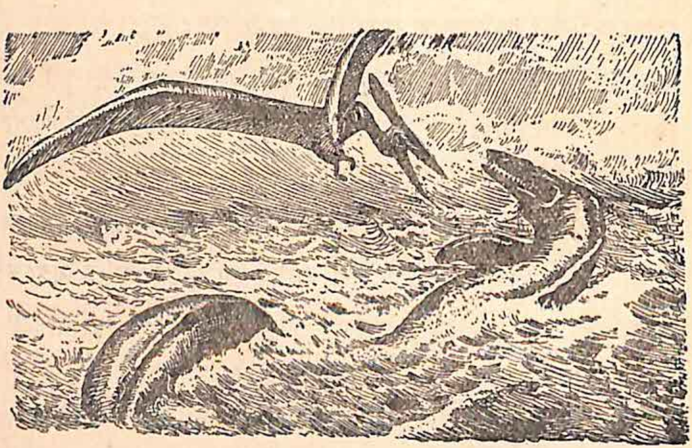
ইক্‌তিওর্নিস্ ইত্যাদি আবির্ভূত হয়েছে। এদের শক্ত শক্ত দাঁত ছিল এবং সাঁতার কাটতে আর ডুব দিতে চমৎকার অভ্যস্ত ছিল (চিত্র ১৮)।

উড়ন্ত প্যাঙ্গোলিনদের মধ্যে অতিকায় তেরানোদন্‌দের আবির্ভাব হয়েছে। এগুলির পাখনা দিয়ে দিয়ে অতি সহজেই আস্ত এক ঘোড়ার গাড়ি টেনে ফেলতে পারা যেত (চিত্র ১৯)।

ডাঙায় এককালে হিংস্র একটি প্রাণী বাস করত, নাম তার তিরানোসেরাস্ (চিত্র ২০), লম্বায় ১৪ মিটার। এরা সমস্ত স্থলচর প্রাণীর আতঙ্কস্বরূপ হয়ে উঠেছিল। এদের



চিত্র ১৮ ॥ হেস্‌পেরোর্নিস। মাছ ধরছে।



চিত্র ১৯ ॥ দশ মিটার লম্বা সামুদ্রিক সরীসৃপসদৃশ মোসাসেরাস্‌ উড়ন্ত প্যাঙ্গোলিন তেরানোদনকে ধরতে চেষ্টা করছে।

মাথাটা ছিল প্রকাণ্ড এবং সামনের পা ছিল খাটো (অবশ্য শরীরের তুলনায়)। সামনের পায়ে দুটি আঙুল ছিল। তাদের দাঁত ছিল ছোরার মত, তার ধার বরাবর ছিল আবার ছোট ছোট দাঁত। সমুদ্রেও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মেছো-প্যাঙ্গোলিন —ইক্‌তিওসেরাস, সর্পসদৃশ মোসোসেরাস্ এবং অদ্ভুতদর্শন সব জীব (যাদের গলা ছিল সাপের মত লম্বা) ছিল। শেষোক্ত প্রাণীগুলির নাম ছিল এলিয়াস্‌মোসেরাস্।

কিন্তু ক্রেটেসাস্ পর্যায়ে পৃথিবীতে কেবল অতিকায় সরীসৃপই ছিল না। এই সময়ে তাদের ভিতর নানাপ্রকার ছোট ছোট জীবও বাস করত, তুচ্ছ সব ছোট ছোট জীব, ইঁদুরের মত আকার, স্তন্যপায়ী। এরাই ভবিষ্যতে পৃথিবীর অধিকর্তা হয়ে বসেছিল। তাদের ভিতরে এমন সব প্রাণীও দেখা দিয়েছে, যারা স্থলজীবনে সম্পূর্ণরূপে অভ্যস্ত এবং আজকালকার অধিকাংশ স্তন্যপায়ীর মতই বংশ বিস্তার করত, অর্থাৎ জ্যান্ত জ্যান্ত ছেলেমেয়ের জন্ম দিত এবং তার ফলে তাদের বিরাট এক সুবিধে হত। এদের সন্ততিদের জীবন আকস্মিক ঘটনা বা সূর্যরশ্মির পরিবর্তনশীলতার উপরে নির্ভর করত না।

ক্রেটেসাস্ পর্যায়ের শেষে স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ভিতরে একদল ছোট প্রাণীর আবির্ভাব হয়। এরা পোকা খেয়ে বাঁচত। (সাধারণ সব সজারু বর্তমানে এদের প্রতিভূ)। এদের পরে অন্য কতকগুলি কীটভোজী প্রাণীর আবির্ভাব হয়। এদের নাম তুপাইয়া। আকারে এগুলি কাঠবিড়ালির চেয়ে

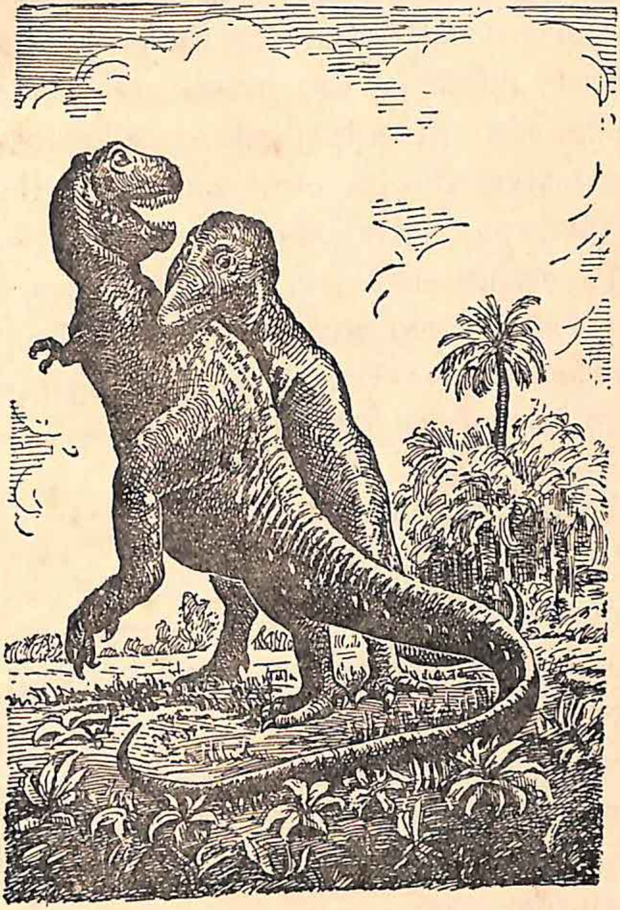
বড় ছিল না এবং বাস করত গাছে গাছে (সংযোজন ২ দেখুন)। তুপাইয়া থেকে বানর, আর বানর থেকে মানুষের উৎপত্তি হয়েছে। এটা কাইনোজয়িক মহাযুগে সম্পন্ন হয়েছে।

প্রাণী জগতের দীর্ঘকালব্যাপী পরিবর্তনের ফলে মানুষের সরাসরি পূর্বপুরুষ যে বানর-মানুষ তার এবং অবশেষে আজকালকার মানুষের উৎপত্তি হয়েছে। এর জন্যে প্রায় ৬ কোটি বছর সময় লেগেছে।

ক্রেটেসাস্ পর্যায়ের সঙ্গে সঙ্গে সরীসৃপের আধিপত্য চলে গেল। বড় বড় প্যাঙ্গোলিন বিলুপ্ত হল। দাঁতাল পাখিগুলিও লোপ পেল। স্তন্যপায়ীদের আধিপত্য শুরু হল। পৃথিবীর ইতিহাসে কাইনোজয়িক মহাযুগের পত্তন হল। শুরু হল নবজীবনের যুগ।

৬ কোটি বছর আগে পৃথিবীতে যে বিপুল পরিবর্তন হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। সুপরিব্যাপ্ত সমুদ্র ছোট হয়ে যেতে লাগল, আর স্থলভাগ বেড়ে যেতে লাগল। স্থলভাগের সীমা ক্রমেই বর্তমানকালের আকৃতি পেতে লাগল। মেসোজয়িক মহাযুগের শেষেও একটি প্রণালী উরাল পর্বতমালা এবং নোভাইয়া জেমল্যাকে ইউরোপ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। প্রণালীটি প্রথমে একটি বড় উপসাগর হয়ে গেল এবং পরে একেবারে শুকিয়ে গেল। অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা, উত্তর এবং দক্ষিণ আমেরিকার আকার বেশ বেড়ে গেল। তাদের আকার হল এখনকার মত। কর্ডিলেরা এবং উত্তর আমেরিকাকে বিচ্ছিন্ন

করে রেখেছিল যে সাগরাঞ্চল তা একেবারে শুকিয়ে গেল। উদ্ভিদ এবং প্রাণীজগতে বিপুল পরিবর্তন হল। জলবায়ু ক্রমেই



চিত্র ২০॥ মারণাত্মক কামড়। চোদ্দ মিটার লম্বা তিরানোসেরাস। পৃথিবীর সর্বকালের শিকারী প্রাণীর মধ্যে এরাই সবচেয়ে বড়।

মহাদেশীয় হয়ে উঠল। মেসোজয়িক মহাযুগের সমস্ত উড়ন্ত প্যাঙ্গোলিন মরে গেল। ৫০-৬০ টন ওজন এবং ৩০ মিটার দৈর্ঘ্যের সমস্ত অতিকায় প্যাঙ্গোলিন, অজস্র স্থলচর শ্বাপদ সব মরে গেল। কেননা এদের দেশের উষ্ণতা সৌরতাপের উপর নির্ভরশীল। পরিবর্তিত অবস্থায় অভ্যস্ত হতে না পারায় সামুদ্রিক দানব ইক্‌তিওসেরাস্, প্লেজিওসেরাস্ এবং অন্যান্য সমস্ত সামুদ্রিক শ্বাপদ সব লোপ পেল। উষ্ণশোণিতযুক্ত প্রাণীগুলি নতুন অবস্থায় বেশি অভ্যস্ত। তারাই বিপুল সংখ্যায় পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ল, তারাই পৃথিবীর প্রধান হয়ে উঠল। এই প্রাণীগুলি হচ্ছে ছোট ছোট কীটভোজী প্রাণীর বংশধর, মেসোজয়িক মহাযুগের মাঝামাঝি জন্মেছিল, প্রায় ১৩ কোটি বছর আগে। উদ্ভিদ্‌জগতও অন্য রকম হয়ে গেল।

কাইনোজয়িক মহাযুগ

পৃথিবীর ইতিহাসে 'নবজীবনের মহাযুগ' শুরু হল। গ্রীক ভাষায় বৈজ্ঞানিকেরা 'নবজীবনের মহাযুগ'কে বলেন 'কাইনো-জয়িক এরা' বা স্রেফ 'কাইনোজই'। কাইনোজয়িক মহাযুগ এখনো চলছে। এর মধ্যে পৃথিবী ক্রমে ক্রমে তার সমকালীন রূপ পরিগ্রহ করেছে। অবশ্য এই যুগের শেষ দিকেই কেবল, অর্থাৎ শেষ দশ-বিশ হাজার বছরেই পাহাড়, সমভূমি, সমুদ্র এবং নদীগুলি আমাদের এখনকার পরিচিত রূপ পেয়েছে। দীর্ঘকালব্যাপা বিবর্তনের ফলে সমস্ত সমকালীন প্রাণী এবং উদ্ভিদের উৎপত্তি হয়েছে এবং পৃথিবীরও ইতিহাসে সবচেয়ে

মূল্যবান ঘটনা ঘটেছে অর্থাৎ মানুষের উৎপত্তি হয়েছে। মানুষ প্রাণীজগতে একেবারেই বিশিষ্ট। এটা ঘটেছিল প্রায় দশলক্ষ বছর আগে। এইজন্যে কাইনোজয়িক মহাযুগকে দুটি অসমান ভাগে ভাগ করা হয়ঃ টারসিয়ারি পর্যায় যা ৫·৯ কোটি বছরে স্থায়ী হয় এবং এ্যানথ্রোপোজেনাস্ পর্যায়ে, যার মানে পৃথিবীতে মানুষের উদ্ভবের কাল। এই পর্যায়টি প্রায় দশলক্ষ বছর আগে শুরু হয়েছিল আর এখনো চলছে। তবে এ্যানথ্রোপোজেনাসের বদলে প্রায়ই কোয়ার্টারনারি পর্যায় নামটি ব্যবহার করা হয়। এ নামটি অর্থহীন হয়ে গেছে। টারসিয়ারি এবং কোয়ার্টারনারি নাম দুটি সেই সময়কার (১৮ শতাব্দীর শেষ— ১৯ শতাব্দীর প্রারম্ভ) যখন পৃথিবীর কাঠামোর ভেতরের সমস্ত ধাতব পদার্থকে 'প্রাথমিক', 'দ্বিতীয়' এবং 'তৃতীয়' নামে তিনটি ভাগে ভাগ করা হত। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে 'চতুর্থ' বা 'কোয়ার্টারনারি' আলাদা করে নেওয়া হয়েছিল। বর্তমানে এই নাম তার জন্মকালীন অর্থ হারিয়ে ফেলেছে এবং কেবল স্মৃতি হিসেবে রয়ে গেছে।

কাইনোজয়িক পর্যায়ের প্রারম্ভের ভূগোল মোটেই আজকালকাল ভূগোলের মত ছিল না। যেখানে এখন পশ্চিম সাইবেরীয় নিম্নভূমি, কাইনোজয়িক মহাযুগে সেখানে ছিল এক সমুদ্র, যার নাম দেওয়া হয়েছে তেতিস্। এটি ইয়োরোপ এবং এশিয়াকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। উরালের পশ্চিম দিকের ঢালু পাশটি বিধৌত করত এই সমুদ্র। এখনো এখানে তার চিহ্ন ঢেউয়ের আকারে রয়ে গেছে। সমুদ্রের পূব

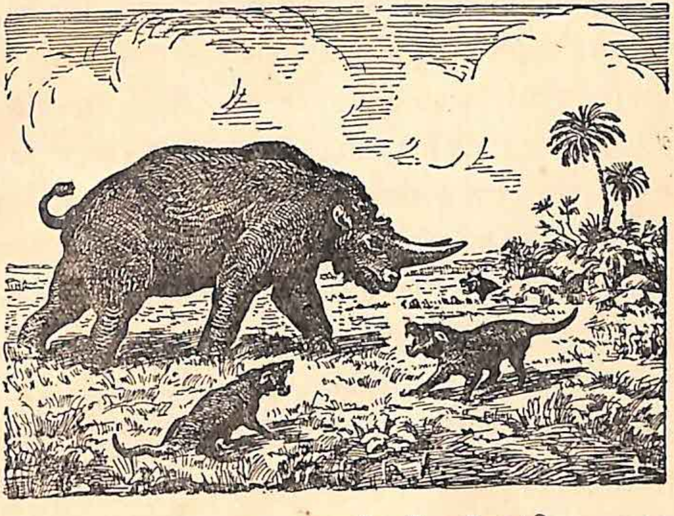
পাড় ইনিসী নদীর বাঁ ধার অবধি বিস্তৃত ছিল। উত্তরে এই সাগর তুষারময় উত্তরমেরুসাগরে মিশে গিয়েছিল। আর দক্ষিণে মিলেছিল ভারত মহাসাগরের সঙ্গে ; পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগরে। পশ্চিম ইয়োরোপের পুরোটা এবং পূর্ব ইয়োরোপের দক্ষিণাংশ সমুদ্রে নিমজ্জিত ছিল। এর মাঝে মাঝে দ্বীপের আকারে বেরিয়েছিল ককেসাস, বলকান আপেনাইন্, কার্পেথিয়ান্, পিরেনিজ্ এবং অন্যান্য জায়গা। সুবিস্তৃত এক সমুদ্র কাজাখ্স্তানের সমকালীন প্রান্তরভূমি এবং বেৎপাক্-দাল্ মরুভূমির পশ্চিমাংশ এবং তুরান্স্কি নিম্নভূমিতে বিরাজ করত। ইয়োরোপকে মনে হত এক প্রকাণ্ড দ্বীপের মত। তার আকার ছিল এখনকার গ্রীনল্যাণ্ডের মত। উত্তর-পশ্চিম দিকে ছিল একটি স্থলভাগ, তার সঙ্গে লাগানো নোভাইয়া জেমল্যা দ্বীপ। আরব মরুভূমি এবং আফ্রিকার সমস্ত উত্তরার্ধ ছিল সমুদ্রতল।

উত্তর এবং দক্ষিণ আমেরিকা ইতিমধ্যেই এখনকার মত দেখতে হয়েছে, যদিও অনেকগুলি সামুদ্রিক প্রণালী দিয়ে তা বিভক্ত। প্রশস্ত একফালি স্থলভাগ দিয়ে উত্তর আমেরিকা, গ্রীনল্যাণ্ড এবং এশিয়া যুক্ত ছিল।

অস্ট্রেলিয়াও প্রায় এখনকার মত হয়েছিল। বড় একটি স্থলভাগের সঙ্গে নিউগিনি দ্বীপটি ছিল।

কাইনোজয়িক মহাযুগে স্থল এবং জলভাগের বিপুল পরিবর্তন হয়েছিল। স্থলভাগের বৃদ্ধি এবং সমুদ্রের সঙ্কোচনের ফলে। টারসিয়ারি পর্যায়ের মাঝখানে ভূমধ্যসাগর, কৃষ্ণসাগর

এবং উত্তর সাগরের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। তেতিস্ সাগর একসারি হ্রদে পরিণত হয়েছিল। এগুলির ধারে ধারে চমৎকার সব উদ্ভিদের জন্ম হয়েছিল। তাদের আকর্ষণেই নানা ধরনের বহু জন্তু এসেছিল।



চিত্র ২১॥ হায়নার মত দেখতে শিকারী প্রাণী হাতীর চেয়ে বড়, অতিকায় আর্সিনয়থেরিকে আক্রমণের ব্যর্থ চেষ্টায় রত।

টারসিয়ারি পর্যায়ের একেবারে শেষে সমস্ত স্থলভাগ তাদের সমকালীন আকৃতি প্রাপ্ত হয়েছে। আকৃতি পায়নি কেবল এশিয়া ও ইয়োরোপের উত্তরাংশ। গ্রেট ব্রিটেন এবং নোভাইয়া জেমল্যা দ্বীপ দুটি ইয়োরোপের সঙ্গে যুক্ত ছিল। গ্রীনল্যাণ্ড, উত্তর আমেরিকা এবং এশিয়ার মধ্যে সুপ্রশস্ত স্থল সংযোগ রয়ে গেল।

প্রায় পুরো টারসিয়ারি পর্যায়ব্যাপী পৃথিবীতে উষ্ণ জলবায়ুর আধিপত্য ছিল। জল এবং স্থলের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই জলবায়ুও নিশ্চয়ই উদ্ভিদ এবং প্রাণীজগতের বিশেষত্ব নির্ণয় করেছিল। উষ্ণ সাগরগুলিতে নানা ধরনের বহু মেরুদণ্ডহীন প্রাণী বাস করত। এগুলি হচ্ছে জেলি ফিশ এবং সামুদ্রিক সজারু, সামুদ্রিক তারামাছ ইত্যাদি। প্রবাল, লামেলি ব্রাঙ্কিয়া এবং মলাস্ক্-এর সংখ্যা বিশেষভাবে বেড়ে গিয়েছিল। এগুলির কিছু সাগরের তলায় হেঁটে বেড়াত, কিছু কিছু সাগরের মাটির তলায় ঢুকে থাকত, কিছু নানান শক্ত জিনিসের ভিতর গর্ত করে থাকত আর আঠালো ধরনেরএকটা সূতো দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে থাকত। অক্টোপাস, কাঁকড়া, নানান ধরনের হাঙ্গর ছিল প্রচুর। আর ছিল এখনকার হাড়ওয়ালা মাছের মত মাছ। মেসোজয়িক মহাযুগের ভয়াল শিকারী প্রাণী ইক্‌তিওসেরাসগুলির বদলে এল দাঁতাল তিমি।

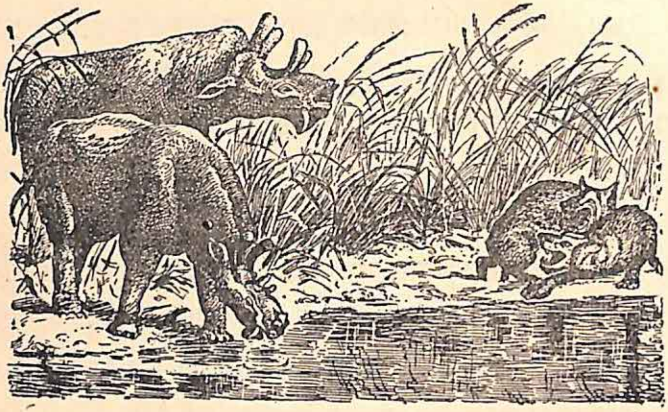
স্থলচর প্রাণীর এবং উদ্ভিদের জগৎটা ছিল বিশেষ ধরনের, দেখতে মোটেই এখনকার মত ছিল না।

যাদের রক্তের উষ্ণতা কম বেশি হয় না, সেই সব প্রাণী স্থলে কর্তৃত্ব করতে লাগল। আর সবার সঙ্গে স্তন্যপায়ী প্রাণীগুলির পার্থক্য ছিল এই যে এদের প্রকৃতিদত্ত ক্ষমতা ছিল আশ্চর্য রকমের বেশি এবং আকারও ছিল নানান রকমের। কাইনোজয়িক মহাযুগের প্রথমার্ধেই সমকালীন হিংস্র প্রাণী ক্রেওদন্তা এবং বর্তমানকালের বহুখুর-যুক্ত প্রাণী কন্দিলার্থ্রার উদ্ভব

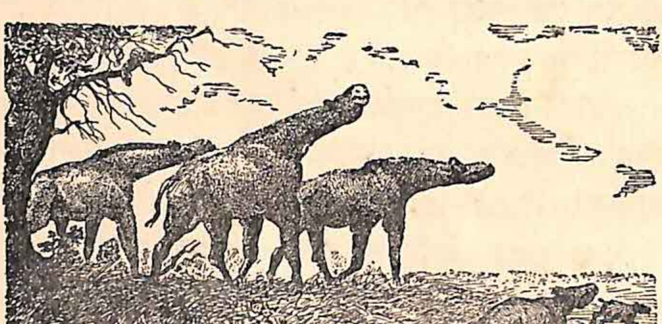
হয়েছে। কন্দিলার্থা দেখতে ছোট, আকারে নেকড়ে বাঘের চেয়ে বড় নয়। কীটভোজী রোডেন্ট, কেইরোপতেরা প্রভৃতি প্রাণী তখন নানান প্রকারের ছিল। এই সময়েই মানুষের প্রাচীন জন্মদাতা বানরের প্রাচীনতম পূর্ব-পুরুষদের আবির্ভাবকাল।

তৃণভোজী প্রাণীদের কতকগুলির আকার হল বিশাল। যেমন আর্সিনয়থেরিয়াম (চিত্র ২১) দ্বিশৃঙ্গ প্রাণী, আকার হাতীর চেয়েও বড়। শৃঙ্গযুক্ত তিতানোথেরিয়াম্ বিপুলকায় এবং প্রায় চলৎশক্তিহীন ষড়শৃঙ্গ দিনোসেরাস্ (চিত্র ২২) এবং গণ্ডারের শৃঙ্গহীন পূর্বপুরুষ ইন্দ্রিকোথেরিয়াম্ (চিত্র ২৩), এর উচ্চতা পাঁচ মিটার পর্যন্ত হত। এগুলি হচ্ছে সর্বকালের স্তন্যপায়ীদের মধ্যে বৃহত্তম। কাজাখ্স্তানে এগুলির প্রচুর দেহাবশেষ পাওয়া গিয়েছে। বিজ্ঞান আকাদেমির মস্কোস্থিত জীবাশ্ম বিজ্ঞানের যাদুঘরে এগুলির কঙ্কাল দেখতে পাওয়া যাবে। কাইনোজয়িক মহাযুগের প্রথমার্ধে হাতীর পূর্বপুরুষরাও আবির্ভূত হয়েছিল, দেখা দিয়েছিল ঘোড়ার পূর্বপুরুষ, বিড়ালের চেয়ে একটু বড়, সুদৃশ্য এওহিপ্পাস্। এগুলির সামনের পায়ে চারটি আঙুলের মত চারখানি খুর, আর পিছনের পায়ে তিনখানি।

অর্ধবিলুপ্ত বিরাট বিরাট শিকারী ডাইনোসরাসদের স্থান এন্দ্রিয়ুসারকুস্ এবং পাত্রিয়োফেলিস্ গ্রহণ করেছিল। এন্দ্রিয়ুসারকুস্-এর মাথা মিটার-খানেক লম্বা, দাঁত ভোঁতা কিন্তু তা দিয়ে যাকে ইচ্ছে থেতলে দেওয়া যায়। পাত্রিয়ো-



চিত্র ২২ ॥ টারসিয়ারি পর্যায়ের স্তন্যপায়ীদের প্রতিভূ। আজকালকার শিকারী প্রাণীদের পূর্বপুরুষ অক্সিয়েন অতিকায় ডাইনোসরাসগুলিকে আক্রমণ করবে কিনা ভাবছে।



চিত্র ২৩ ॥ কাজাখ্‌স্তানের হ্রদের পাড়ে, টার্শিয়ারী পর্যায়ের মাঝামাঝি, প্রায় ৪ কোটি বছর আগে। পাঁচ মিটার লম্বা ইন্দ্রিকোথেরিয়াম্‌ এবং দুটি ছুটন্ত আল্লোংসেরোপ্‌স্‌ (আজকালকার গণ্ডারদের পূর্বপুরুষ)।

ফেলিস্-এর আকার ছিল ভালুকের মত আর দাঁত ছিল বাঘের মত। টারসিয়ারি পর্যায়ের প্রথমার্ধের উষ্ণ জলবায়ু, তৃণভোজীদের প্রলোভনকারী অজস্র মাঠ তাদের ভাল শিকারের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল।

বহু প্রাণী দ্বারা অধ্যুষিত বনগুলিতে বোর্বন্ এবং পেনাতে তালগাছ, মিটার, ইউ, ম্যাগ্নোলিয়া, লরেল, ওয়ালনাট, জলাভূমিজাত সাইপ্রেস (তোবোল্স্কি-র কাছে) এবং বিরাট বিরাট সরল বর্গীয় বৃক্ষ সেকোইয়া (বর্তমানে ক্যালিফর্নিয়াতে লাল ওয়েলিংটনিয়া গাছের আকারেই কেবল বেঁচে আছে) প্রভৃতি গাছ জন্মাত। দক্ষিণ গোলার্ধে সরলবর্গীয় বৃক্ষগুলি বিরাট বিরাট অরণ্যের সৃষ্টি করেছিল। এগুলি বাদামি রঙের পাথুরে কয়লার উপাদান সরবরাহ করেছে।

'বৃক্ষবাসী' প্রাণীদের মধ্যে আমরা ইতিমধ্যেই প্রথম মনুষ্যাকৃতি বানর আমফিপিথেকাস্ এবং প্রোপ্লিওপিথেকাস্ দেখতে পাই। প্রাণীগুলি ছোট ছোট, লম্বায় ৩০—৩৫ সেন্টিমিটার (লেজ বাদ দিয়ে)। বিবর্তনের ফলে এগুলি এদের ক্রেটেসাস্ পর্যায়বাসী কীটভোজী পূর্বপুরুষদের থেকে অনেক তফাত হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য প্রথম মানুষের উৎপত্তি হতে আরো ৩ কোটি ৫ লক্ষ বছর দরকার হয়েছিল। প্রথম মানুষ আম্ফিপিথেকাস্ এবং প্রোপ্লিওপিথেকাস্দের দূর বংশধর।

পৃথিবীর ইতিহাসে কতকগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল শেষ ২.৫—২.৭ কোটি বছরে, টারসিয়ারি পর্যায়ের দ্বিতীয়ার্ধে—মায়োসিন্ এবং প্লিওসিন্ যুগ।

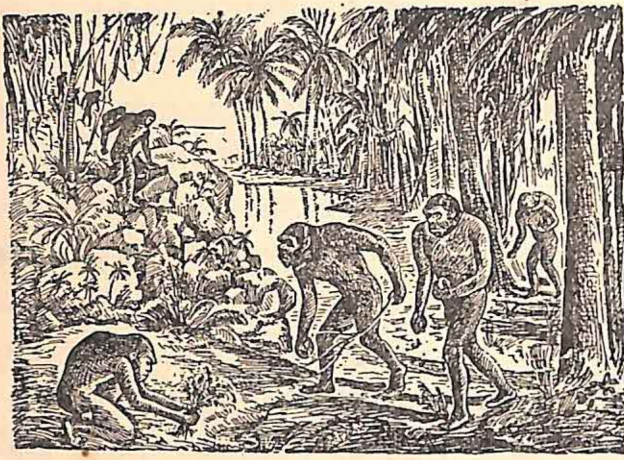
পশ্চিম ইয়োরোপের বনাঞ্চলগুলিতে এই সময়ে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় উদ্ভিদ বেশ কমে গিয়েছিল এবং পর্ণমোচী বৃক্ষ বেশ ঘন ঘন দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। কিন্তু শীতকাল তখনো বেশ গরম ছিল। এখনকার সোভিয়েত ইউনিয়নের উত্তরাঞ্চলেও এত গরম ছিল যে তোবোল্স্কির কাছে এবং তার উত্তরেও ওয়ালনাট্, মেপ্ল্, এ্যাসট্রি আর হর্ণবীম্ গাছ জন্মাত।

প্রাণীদের ভিতরে ইতিমধ্যেই, প্রায় আজকালকার মত আকৃতিবিশিষ্ট ভালুক, হায়েনা, নেকড়ে বাঘ, মার্টেন, ব্যাজার, বুনো ভালুক ইত্যাদি উদ্ভূত হয়েছে। বড় বড় স্তন্যপায়ীদের থেকে আজকালকার হাতীর পূর্বপুরুষ মাস্তোদন্, দিনোথেরিয়াম্, জিরাফ, গণ্ডার ইত্যাদির উৎপত্তি হয়েছে। ওল্টানো কোদালের মত দুটি শুঁড় দিনোথেরিয়ামের নীচের চোয়াল থেকে ঝুলত। গাছে গাছে বহু বানর বাস করত। এবং তাদের ভিতরে বাস করত মনুষ্যাকৃতি বানর দ্রিওপিথেকাস্। দ্রিওপিথেকাস মাঝে মাঝে গাছ থেকে নেমে বনের ধার দিয়ে খাবার খুঁজে বেড়াত (সংযোজন ২ দেখুন) সত্যিকার পাখির এবং কীটভোজীদের মধ্যে প্রজাপতি এবং হুলফোটানো পতঙ্গের আবির্ভাব তখন হয়েছে। সাগর এবং নদী তখন প্রাণীপূর্ণ, তারা ইতিমধ্যেই বর্তমানকালীন রূপ পেয়েছে।

শেষ ১ কোটি ১০ লক্ষ বছরে সমকালীন প্রাণীগুলির সরাসরি যে পূর্বপুরুষ, তাদের আবির্ভাব হয়েছে। এই সময়টি প্লিওসিন যুগের অন্তর্গত।

ক্রমে ক্রমে পৃথিবীর উত্তরাংশের জলবায়ু শীতলতর হচ্ছিল। প্রাণীদের মধ্যে আমাদের ঘোড়ার বহু পূর্বপুরুষ ট্রাইডাক্‌টিলাস্ হিপ্‌পারিয়ন্‌এর উদ্ভব হয়েছে, আর তার পরে উদ্ভব হয়েছে বর্তমান কালের ঘোড়ার। মাস্তোদন সব জায়গা থেকেই লোপ পেয়ে গিয়েছিল। আর তাদের জায়গা দখল করেছিল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সমতল-ললাট হাতী। বুনো উট, বিভিন্ন প্রকারের হরিণ সদৃশ প্রাণী এবং হরিণ, তুর্বলদন্ত বাঘ এবং অন্যান্য শিকারী প্রাণী স্বাভাবিক আকৃতিবিশিষ্ট হয়ে উঠল। আর পাখিদের ভিতরে স্বাভাবিক আকৃতির হয়ে উঠেছে উটপাখি। এগুলি তখন উপ-আজভ, কুবান্, ক্রিমিয়ার উপকূল অঞ্চলে বাস করত।

বিভিন্ন প্রকার মনুষ্যাকৃতি বানরের ভিতর অস্ত্রালোপি-থেকাস্ (যার মানে নবীন বানর) উদ্ভূত হয়েছিল। এরা জীবনের অধিকাংশ সময় গাছে নয়, মাটির উপরেই কাটাত। ফলে এদের বংশধরেরা ক্রমে ক্রমে নিশ্চিতভাবে মাটিতে বসবাস শুরু করল এবং বানর-মানুষে রূপান্তরিত হল। এগুলির নাম পিতেকানথ্রোপাস্ (চিত্র ২৪)। এদের অবশেষ ইয়াডা দ্বীপে পাওয়া গেছে। এরা প্রায় মানুষের মত জীবই ছিল, জন্তু জানোয়ার শিকার করার জন্যে পাথর এবং কাঠ ব্যবহার করত, একথা মনে করার সঙ্গত কারণ আছে। কিন্তু আগুনের ব্যবহার তাদের জানা ছিল কিনা তা জানা যায়নি। আমাদের সময়কাল থেকে দশ লক্ষ বছরের কিছু আগে এরা বেঁচে ছিল। এই দশলক্ষ বছরকালে,—কিছু



চিত্র ২৪ ॥ একদল পিতেকানথ্রোপাস্—বানর-মানুষ।

বৈজ্ঞানিকের মতে ছ লক্ষ বছরকালে—পৃথিবী তার বর্তমান রূপ নিশ্চিতভাবেই পেয়েছিল এবং পৃথিবীতে প্রথম মানুষ উদ্ভূত হয়েছিল। এটা পৃথিবীর ইতিহাসের সেই যুগ, যার ভিতরে আমরা নিজেরাও বাস করছি। একে কোয়ার্টারনারি বা এ্যানথ্রোপোজেনাস্ বলা হয়। শব্দটি গ্রীক আন্থ্রো-পোস্—মনুষ্য এবং জেনস্—বংশ, জন্ম, এই শব্দ দুটি থেকে এসেছে, অর্থাৎ শব্দটির অর্থ হচ্ছে মানুষের উদ্ভবের পর্যায়।

এই শেষ দশলক্ষ বছরে উদ্ভিদ এবং প্রাণীরা (এর ভিতরে মানুষও আছে) আমাদের নিকট তারা যে রূপে পরিচিত, সেই রূপ পাবার জন্যে ক্রমবিকাশের জটিল এবং দীর্ঘকালব্যাপী প্রক্রিয়া পার হয়ে এসেছে। এই সময়ে পাহাড় এবং নিম্ন-ভূমিগুলিও আমাদের পরিচিত বর্তমানকালীন রূপ পরিগ্রহ

করেছে। কিন্তু এই অপেক্ষাকৃত অল্প কাল-পরিসরেও বিরাট বিরাট ব্যাপার ঘটেছে— যেমন বাল্‌টিক সাগর, কার্‌স্কি সাগর, এসেইস্কি সাগর, লোহিত সাগর ইত্যাদি গঠিত হয়েছে, মাল্‌টা আর সিসিলি আফ্রিকা থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছে, গ্রেট ব্রিটেন আলাদা হয়েছে ইয়োরোপ থেকে। এশিয়ার স্থলভাগ থেকে এই সময়ে নোভাইয়া জেমল্যা, নব সাইবেরীয় দ্বীপ, উত্তর আমেরিকা, জাপান এবং জন্দ্‌ দ্বীপ আলাদা হয়ে গিয়েছে। এগুলি বিপুল তুষার সম্পাতের সময়েও এশিয়ার সঙ্গে যুক্ত ছিল। উজ্‌বা, মানীচ্‌ এবং দার্দানেলিস প্রণালীর মাধ্যমে আরল, আজভ, কাস্পিয়ান, কৃষ্ণসাগর এবং ভূমধ্য সাগরের মধ্যে সংযোগ পুনঃ পুনঃ স্থাপিত হয়েছে, আবার বিচ্ছিন্ন হয়েছে। এই পর্যায়ে স্থলভাগের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অঞ্চল অবনমিত হয়েছে, উত্থিত হয়েছে এবং এগুলির সঙ্গে যুক্ত সমুদ্র প্রসারিত হয়েছে। সংকুচিত হয়েছে, কখনো বিস্তীর্ণ ভূভাগ প্লাবিত করেছে, কখনো উন্মুক্ত করেছে। এশিয়ার উত্তরে এই ব্যাপার ঘটেছে সব চেয়ে বেশি। কোয়ার্টারনারি পর্যায়ে ককেসাস্‌, আলতাই, সাইয়ান, আল্পস্‌ প্রভৃতি পাহাড় নিশ্চিতরূপে গঠিত হয়েছে।

এ্যান্‌থ্রোপোজেনাস্‌ পর্যায়ের আগেই পৃথিবী ক্রমে ক্রমে শীতল হয়ে এসেছে। তাতে এই পর্যায়ের মাঝামাঝি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হিমবাহের সৃষ্টি হয়েছিল। এগুলি যখন বড় হয়ে উঠেছিল তখন বিপুল তুষারাবরণে (জায়গায় জায়গায় ২ কিলোমিটার পর্যন্ত যার বেধ) ইয়োরোপ, উত্তর এশিয়া এবং উত্তর আমেরিকার বেশ কিছু অংশ ঢেকে গিয়েছিল।

কোয়ার্টারনারি পর্যায়ের প্রারম্ভেও জলবায়ু অপেক্ষাকৃত উষ্ণ ছিল। তখনকার প্রাণীজগৎ আর বর্তমানকালীন প্রাণী-জগতের ভিতরে বেশ পার্থক্য ছিল। এই সময়ে তথাকথিত প্রাচীন এবং নবীন হাতী, মার্ক গণ্ডার, বুনো উট, বড় বড় ঘোড়া, নানাপ্রকার হরিণ-সদৃশ প্রাণী এবং হরিণ, ত্রোগোন্থেরি, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড এল্‌ক্‌ প্রভৃতি বিপুল বিস্তারলাভ করেছে। ত্রোগোন্থেরি আমাদের পাহাড়ী ইঁদুরের মত গর্তে বাস করত, কিন্তু বাইরের চেহারা এবং আকার ছিল ভোঁদড়ের মত। আর পাখিদের ভিতরে বিস্তারলাভ করেছে ইয়োরোপ এবং এশিয়ার উটপাখি, এখন এরা কেবল আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকায় বেঁচে আছে। কিন্তু এশিয়া এবং ইয়োরোপে সেই সময়ে এলাস্‌মোথেরি ছিল সব চেয়ে হিংস্র প্রাণী। এগুলি আকারে বুনো মোষের চেয়ে বড় ছিল এবং দেখতে ছিল গণ্ডারের মত, কেবল বিরাট শিংটি নাকের ডগায় বা কপালে বসানো ছিল। এলাস্‌মোথেরির গলা ছিল প্রায় এক মিটার মোটা। কতকগুলি উষ্ণ দেশে (আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, নিউজিল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া) টারসিয়ারি পর্যায়ে কতকগুলি প্রাণী ছিল, যেমন দুর্বলদন্ত বাঘ, মাস্তোদন, হিপ্‌পারিয়ন, নানা ধরণের শাবকবাহী জীব (অস্টেলিয়া) প্রভৃতি। তখনও জলবায়ু এত উষ্ণ ছিল যে পশ্চিম ইয়োরোপে জলহস্তী ছিল।

কিন্তু এক হাজার বছর চলে গেল, জলবায়ু আজকালকার মত হয়ে এল। আর তার সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভিদ এবং প্রাণীজগৎও

আজকালকার মত হতে লাগল। অবশ্য কোয়ার্টারনারি পর্যায়ের দ্বিতীয়ার্ধেই, সম্ভবত বিপুল তুষারসম্পাতের প্রারম্ভেও প্রাণীজগতের সঙ্গে বর্তমানকালের প্রাণীজগতের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

মনে করা যাক, আমরা দু'লক্ষ বছর আগে মস্কোর কাছাকাছি আছি। রৌদ্রদগ্ধ দিনের শেষে সান্ধ্য শীতলতা নেমে এসেছে। প্রাগৈতিহাসিক জলাভূমিতে দীর্ঘশৃঙ্গ বাইসন এবং অশ্বযূথ শান্ত চিত্তে তৃণভোজনরত। জলাশয়ের পাশে ভ্রমণরত অতিকায় হরিণের অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি মনোরমভাবে দিগন্তে প্রতিভাত। তাদের গর্বোত্থিত শির শৃঙ্গভারে পশ্চাতে ঈষৎ অবনত। লঘুচিত্তে ক্রীড়াশীল শাবকসহ শৃঙ্গহীন ভয়ার্ত স্ত্রীহরিণদল দৃশ্যমান। কিন্তু হঠাৎ বিদ্যুৎগতিতে হরিণগুলি অদৃশ্য হয়ে গেল, হিমশিলাপাতের মত শব্দসহকারে অশ্বযূথ ধাবিত হল এবং অদৃশ্য হয়ে গেল, গণ্ডার এবং বাইসনগুলি বিচলিত হয়ে উঠল। আরক্তনয়নে বিশালকায় বৃষগুলি তাদের লোমশ দীর্ঘশৃঙ্গ শির অবনত করল এবং খুর দিয়ে হিংস্র আক্রোশে মাটি খুঁড়তে লাগল। তৎকালের সর্বাপেক্ষা ভয়াল প্রাণী—গুহাবাসী সিংহের আগমন বার্তা পেয়েছে তারা। ত্রোগোন্‌থেরি হস্তীই কেবল দু মিটার দীর্ঘ-দন্তবিশিষ্ট মস্তক ধীরে ধীরে আন্দোলিত করতে করতে যেন প্রশান্তচিত্তই রয়ে গেল। কিন্তু তারাও তাদের শাবকদের কাছে চলে গেল, যে কোন মুহূর্তে তাদের রক্ষা করার জন্যে প্রস্তুত হল।

উত্তর দিকে যখন বিপুল তুষারসম্পাতের প্রথম লক্ষণগুলি

ফুটে উঠেছে তখন সমকালীন মস্কো এলাকাটি এই রকম ছিল।

মস্‌কভা খালটি এখন করার সময়ে এই প্রাণীগুলির শত শত অস্থি পাওয়া গিয়েছে।

আমাদের দেশে এই সময়েও অন্য সব অধুনালুপ্ত প্রাণী যেমন বুনো উট, প্যাঁচানো শিংওলা হরিণ, গুহাবাসী হায়না এবং হরিণ ছিল।

এইসব প্রাণীর সঙ্গে অন্য সব প্রাণীও ছিল। এদের সঙ্গে বর্তমানকালের নেকড়ে বাঘ, শেয়াল, খরগোশ, বেজী এবং অন্যান্য প্রাণীর খুব পার্থক্য ছিল না।

বিপুল তুষারসম্পাতের শুরু হয় যখন সেই সময়ের কাছা-কাছি প্রাণী জগৎ এইরকমই ছিল। কিন্তু দু'লক্ষ বছর আগে পাহাড়ে পাহাড়ে প্রথম হিমবাহগুলি রৌদ্রোদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। এগুলি ধীরে ধীরে পাহাড়ের গা বেয়ে সমভূমিতে নামতে শুরু করেছে। বর্তমানে যেখানে নরওয়ে সেখানে প্রকাণ্ড টুপির মত একটি হিমবাহের উৎপত্তি হয়েছিল। এটি পাশের দিকে নামতে শুরু করল। নেমে-আসতে-থাকা বরফ ক্রমাগত নতুন নতুন অঞ্চল ঢেকে ফেলতে লাগল, সেখানকার অধিবাসী প্রাণী এবং উদ্ভিদগুলিকে ঠেলে অন্যত্র নিয়ে চলল। এশিয়া, ইয়োরোপ এবং উত্তর আমেরিকার বিস্তৃত অঞ্চলে তুষারক্ষেত্রের আবির্ভাব হল। জায়গায় জায়গায় তুষারাবরণের বেধ দু' মিটার পর্যন্ত হল। পৃথিবীতে বিপুল তুষারসম্পাতের যুগ শুরু হল। প্রকাণ্ড হিমবাহটি একবার একটু ছোট হয়ে আসে, আবার দক্ষিণ দিকে চলতে শুরু করে।

ইয়ারোস্লোভিয়া, কস্তোর্ম, কালিনিন্ প্রভৃতি অঞ্চলে বেশ দীর্ঘকাল যাবৎ এই হিমবাহ ছিল। এর ১৪৩০০ বছর আগেকার অবশেষ আমরা জানি, যা লেনিনগ্রাদের কাছে পাওয়া গিয়েছে।

বিপুল তুষারসম্পাত প্রাণী এবং উদ্ভিদ-জগতে অবশ্যই বিস্তারলাভ করেছিল।

এই সময়ে পশ্চিম ইয়োরোপের সমভূমিতে শীতপ্রিয় প্রাণী—কস্তুরী-বৃষ, বল্গা হরিণ, মেরু শৃগাল, শ্বেত উইলোপ্ টার্‌মিগান্, লেমিঙ, লোমশ গণ্ডার এবং ত্রোগোনথেরি হাতীর বংশধর ম্যামথ ইত্যাদি, আর এদের সঙ্গে হরিণ, নেকড়ে বাঘ, শেয়াল এবং বাদামি ভালুক ইত্যাদি দেখা দিয়েছে। দীর্ঘশৃঙ্গ বাইসন কমে এসেছে। মার্ক গণ্ডার, এলাস্‌মোথেরি, গুহাবাসী হায়না, গুহাবাসী ভালুক এবং অন্যান্য প্রাণী বিলুপ্ত হচ্ছে। বিপুল তুষারসম্পাতের যুগের পরে এরা আর বেঁচে থাকেনি।

ককেসাস এবং ককেসাস-উত্তর অঞ্চলের পাহাড়গুলিতে এবং কার্পেথিয়ান, পিরেনিজ পর্বতমালার পাহাড়ী প্রাণীগুলি তখন উপত্যকায় নেমে আসে, আর উত্তর অঞ্চলের প্রাণীগুলি দূর দক্ষিণে বা পশ্চিমে চলে যায়। আমরা জানি ক্রিমিয়ার স্থায়ী বাসিন্দা ছিল শ্বেত উইলোপ্ টারমিগান, মেরু শৃগাল, খরগোশ, বল্গা হরিণ, মেরু অঞ্চলের স্কাইলার্ক এবং অন্য কতকগুলি পাহাড়ী পাখি।

ম্যামথীয় জীবকুল বিস্তারলাভ করেছিল,—এরা হল

কস্তুরী-বৃষ, ম্যামথ, বল্গা হরিণ, লোমশ গণ্ডার প্রভৃতি। সমস্ত পশ্চিম ইয়োরোপ এবং চীনের উত্তরাংশ পর্যন্ত এশিয়ার ভূখণ্ডের প্রাচীন প্রস্তর যুগের মানুষের ভুক্তাবশেষের ভিতরে এদের অবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। ম্যামথ এবং সেই সময়কার লোমশ গণ্ডার দক্ষিণে স্পেন এবং ইতালী পর্যন্ত চলে গিয়েছিল, আর পশ্চিমে গিয়েছিল গ্রেট ব্রিটেন অবধি। পূর্ব এবং পশ্চিম সাইবেরিয়ায় এই একই জীবজন্তু বাস করত, একেবারে উত্তর ধার পর্যন্ত। এখান থেকে কিছু প্রাণী উত্তর আমেরিকায় চলে গিয়েছিল।

কেবল অস্ট্রেলিয়া, ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ এবং মধ্য আফ্রিকায় আগেকার জীবকুল বেঁচে ছিল, যদিও মরে-হেজে যাবার পরে তারা বেশ ক্ষীণ হয়ে পড়েছিল। উত্তর আফ্রিকার জীবকুলে নতুন নতুন প্রাণী যুক্ত হতে থাকে, দক্ষিণ এবং উত্তর এশিয়া থেকে কিছু প্রাণী ও-দেশে চলে যায়।

বিপুল তুষারসম্পাতের শেষে ইয়োরোপ এবং অন্যান্য দেশে সমকালীন জীবকুলের রূপ নিশ্চিতরূপে নির্দিষ্ট হয়ে গেল। এরা প্রধানত বর্তমানকালের প্রাণীরই প্রতিভূ, তবে তাদের বাসভূমি আজকালকার প্রাণীদের থেকে তফাৎ ছিল।

কোয়ার্টারনারি পর্যায়বাসী অতিকায় পূর্বপুরুষদের বংশধরেরা আকারে ছোট হয়ে গিয়ে কোন মতে বেঁচে থাকে এবং পরবর্তীকালে বিলোপপ্রাপ্ত হয়। জীবকুলের এই প্রতিভূরা হচ্ছে অরোক, বাইসন ইত্যাদি।

পৃথিবীর ইতিহাসে এ্যান্থোপোজেনাস্ পর্যায় একটি

কারণে অন্য সব পর্যায় থেকে ভিন্ন হয়ে আছে। কারণটি হচ্ছে মানুষের উদ্ভব। এই ঘটনাটিকেই পর্যায়টির একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বলে মনে করা হয়। মানুষের উদ্ভব পৃথিবীর ইতিহাসের প্রধানতম ঘটনা। পৃথিবীর ইতিহাসে এই প্রথম এমন একটি প্রাণীর উদ্ভব হল, যা পৃথিবীর সর্বকালের অন্য সমস্ত জীব থেকে পৃথক।

কিছু বৈজ্ঞানিক মনে করেন যে এ্যানথ্রোপোজেনাস্ পর্যায়ে একবার নয় কয়েকবার তুষারসম্পাত হয়েছিল। এগুলির মাঝখানে মাঝখানে অপেক্ষাকৃত উষ্ণ হিমবাহ-অন্তর্বর্তী যুগগুলি ছিল।

প্রাচীনতম ভূতাত্ত্বিক পর্যায়েও তুষারসম্পাতের চিহ্ন দেখা গিয়েছে। কিন্তু সেগুলিকে এখনো সর্বত্র ভালভাবে অনুশীলন করা হয়নি।

প্রথম মানুষ কখন দেখা দিয়েছিল

প্রথম মানুষের আবির্ভাব পৃথিবীর ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান ঘটনা। সাধারণত মনে করা হয় যে এটা ঘটেছিল কোয়ার্টারনারি পর্যায়ের প্রারম্ভে, ৫০ থেকে ৬০ লক্ষ বছর আগে। আগেই বলেছি, পৃথিবীর ইতিহাসে এই ঘটনার সারবত্তা চিহ্নিত করার জন্যে অনেক বৈজ্ঞানিক এই পর্যায়কে এ্যানথ্রোপোজেনাস্ অর্থাৎ মনুষ্যোদ্ভবের পর্যায় বলেন।

স্বভাবত প্রশ্ন ওঠে, কখন প্রথম মানুষের উদ্ভব ঘটেছিল, কোথায়, ভূগোলকের কোন বিন্দুতে এটা ঘটেছিল? পৃথিবীস্থ

অন্য সব প্রাণী থেকে একেবারে ভিন্ন প্রকারের এক জীব হিসাবে মানুষ কেন পৃথিবীতে দেখা দিয়েছিল? এবং কেন তারা মূলগতভাবে অন্য প্রাণী থেকে ভিন্ন?

ধর্ম এই প্রশ্নগুলির উত্তর অত্যন্ত 'সরলভাবে' দেয়। প্রায় সাত হাজার বছর আগে ইহুদীদের দেবতা ইয়াগ্‌ভে (ইয়েগোভা) মাটি দিয়ে প্রথম মানুষ আদমকে তৈরি করেছিল এবং পরে তার ঘুমের ঘোরে তার পাঁজরার একখানা হাড় ভেঙে ইভ্‌ নামক মহিলাটিকে তৈরি করেছিল। মিশরবাসীদের ধারণা ছিল কৃন্তুম দেবতা কাদা দিয়ে কুমোরের চাকায় প্রথম মানুষগুলিকে তৈরি করেছিল। গ্রীকরা মনে করত ঝড় এবং বজ্রের দেবতা (প্রধান দেবতা) জেভ্‌স্‌ কাদা দিয়ে প্রথম মানুষগুলিকে বানিয়েছিল আর আফিনা দেবী তাদের 'প্রাণ দান' করেছিল ইত্যাদি ইত্যাদি। এই রকম কল্পকাহিনীতে সত্যের রঙ লাগাবার জন্যে অনেকগুলি কাহিনীকে 'যথাযথভাবে' উপস্থিত করা হয়েছিল। ত্রয়োদশ গ্রেগরীর বাবা 'হিসেব' করেছিলেন যে আদমকে নাকি খৃষ্টপূর্ব ৫১৯৯ সালে তৈরি করা হয়েছিল। আর অন্য সব পাদ্রীরা জোর দিয়ে বলেছিলেন, এটা নাকি খৃষ্টপূর্ব ৪০০৪ সালের ২৩শে ডিসেম্বর সকাল দশটায় 'ঘটেছিল'……বলা হয়েছিল যে (ধর্মবিশ্বাসীদের প্রতারণার উদ্দেশ্যে) আদম প্রায় তিরিশ মীটার (১২৩ ফুট ৯ ইঞ্চি) লম্বা ছিল, আর ইভ লম্বায় ছিল ১১৮ ফুট ৯.৯ ইঞ্চি। এ বিষয়ে সবার সন্দেহ দূর করার জন্যে ম্যামথ-এর হাড় দেখানো হত। এগুলিকে

পূণ্যবান লোকের অস্থি বলে মনে করা হত। কখনো কখনো এগুলিকে গির্জাতেও রাখা হত। যেমন, ভিয়েনাতে সেন্ট্ স্তেফানের গির্জায় একটি অস্থি রাখা হয়েছিল।

বোঝা যাচ্ছে যে মানুষের পূর্বপুরুষদের সম্বন্ধে কোনো ধর্মই সঠিক কিছু বলে না, কারণ ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে মানুষ এখন যেমন, তেমন ভাবেই সৃষ্ট হয়েছিল। মানুষের উচ্চতা কত ছিল সে বিষয়েই কেবল যা একটু মতান্তর।

কোথায় প্রথম মানুষের উৎপত্তি হয়েছিল ?

বিভিন্ন ধর্ম মানুষের আদিম বাসস্থান সম্পর্কে বিভিন্ন জায়গার উল্লেখ করে। প্রাচীন মিশরবাসীদের ধারণা ছিল এই পূণ্যস্থানটা নীল নদীর কাছে হওয়াই সম্ভব। গ্রীকরা ভাবত এই স্থানটি হচ্ছে ওলিম্পিক পাহাড়, আর ইহুদী আর খৃষ্টানেরা মনে করত, এখন মেসোপটেমিয়ায় যেখানে তাইগ্রীস আর ইউফ্রেটিস্ বয়ে যাচ্ছে মোটামুটি সেইখানেই এই স্থানটি। সেখানে নাকি এক নন্দনবন ছিল, তার মাঝে বাস করত আদম আর ইভ্, যতদিন পাপ করার জন্য ঈশ্বর কর্তৃক নির্বাসিত হয়নি ততদিন।

পৃথিবীতে অন্যান্য প্রাণী থেকে একেবারে আলাদা এবং ধীসম্পন্ন প্রাণী হিসাবে মানুষের জন্ম হল কেন? ধর্ম বলে, সবই তাঁর ইচ্ছে। ভগবান দেখলেন তাঁর তৈরি পৃথিবীটা খাসা হয়েছে, তাই তিনি ধীসম্পন্ন মানুষ তৈরি করার কথা ভাবলেন।

বিজ্ঞান দেখিয়েছে, মানুষ ভগবানের সৃষ্টি নয়, তারা সব সময় আজকালকার মতও ছিল না, দশলক্ষ বছর আগে মানুষ প্রাণীজগত থেকে আলাদা হয়ে এসেছে, এর জন্যে মানুষের বানরদের মতো পূর্বপুরুষদের লেগেছে দীর্ঘকাল—প্রায় ৩ কোটি বছরের ক্রমবিকাশের প্রয়োজন হয়েছে। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে বৈজ্ঞানিকেরা একথা সপ্রমাণ করেছেন।

জীবাশ্মবিজ্ঞান (মৃত প্রাণী এবং উদ্ভিদ বিষয়ক বিজ্ঞান) এবং নৃতত্ত্ব (মনুষ্য দেহের গঠন ও ক্রমবিকাশ বিষয়ক বিজ্ঞান) দেখিয়েছে, মানুষের পূর্বপুরুষ কেমন ছিল। পৃথিবীর ইতিহাস বিষয়ক বিজ্ঞান ভূতত্ত্ব, মানুষ এবং মানুষ যাদের থেকে এসেছে সেই প্রাণীদের অন্তর্বর্তী আকারের কালনির্ণয় সম্ভবপর করেছে, পুরাতত্ব (মানুষের প্রাচীন সংস্কৃতির বাস্তব অবশেষ এবং মনুষ্য সমাজের প্রাচীন স্তরগুলির ক্রমবিকাশ অধ্যয়নকারী বিজ্ঞান) মানুষের সমাজের উদ্ভব এবং বিবর্তন, তার ভাবাদর্শ, উৎপাদন সম্পর্ক ইত্যাদি আমাদের কাছে উদ্ঘাটিত করেছে।

বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বৈজ্ঞানিকদের যৌথ প্রচেষ্টায় এইভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে কঙ্কাল এবং মাংসপেশী অনুযায়ী, রক্তের রাসায়নিক সংযুতি অনুযায়ী এবং আর সব সূত্র অনুযায়ী বানর-মানুষের সঙ্গেই মানুষের সবচেয়ে বেশি মিল রয়েছে। এইভাবে, মানুষের সঙ্গে ওরাং ওটাং-এর ৫০ এরও বেশি, গেরিলার ৯০ এবং শিম্পাঞ্জীর প্রায় ১০০ রকম মিলের চিহ্ন বর্তমান। কিন্তু অন্য প্রাণীদের কথা বাদ দিলেও বানর এবং

মানুষের মধ্যে পার্থক্যও প্রচুর। কোন প্রাণাই (বানরও এর ভিতরে আছে) শ্রমসহায়ক যন্ত্র তৈরি করেনি, একেবারে সরলতম যন্ত্রও তৈরি করেনি। বর্শা বানাবার জন্যে কাঠিতে ধার দেয়নি, কাটবার পাত—ছুরি বা চাঁচুনি তৈরি করার জন্যে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী পাথরের টুকরোও ভাঙেনি। উচ্চারণ-বিন্যাস-বিশিষ্ট ভাষার সাহায্যে আর কোন প্রাণীই নিজের মনোভাব প্রকাশ করতে পারে না। মানুষ এবং জীবজন্তুর অঙ্গ-ব্যবস্থায় অন্য আর অনেক পার্থক্য আছে। কিন্তু মানুষের সঙ্গে জীবজন্তুর পার্থক্যগুলির মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান বিষয় হচ্ছে মানুষের ভাষা এবং সচেতন শ্রম, যার সাহায্যে মানুষ তার অস্তিত্বের জন্যে প্রয়োজনীয় সব কিছু করে।

মানুষের সঙ্গে বানরের সাধারণ প্রকৃতির অনেক মিল হওয়া সত্ত্বেও আজকাল যে বানরগুলি বেঁচে আছে তাদের একটিও মানুষের পূর্বপুরুষ ছিল না। বহু অবশেষ অনুশীলন করে দেখা যায়, বানর-মানুষ (যাদের একটি দল থেকে মানুষের উৎপত্তি হয়েছিল) এবং আজকালকার মনুষ্যাকৃতি বানর দ্রিয়োপিথেকাস্ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। দ্রিয়োপিথেকাস্ হচ্ছে ছোট এক ধরণের বানর, প্রায় আড়াই কোটি বছর আগে মাইয়োসিন্ যুগে বাস করত। তার পরে, এই যুগের শেষে, বা একটু পরেও হতে পারে, মানুষের পূর্বপুরুষগুলি আরো স্পষ্টভাবে আলাদা হয়ে গিয়েছিল। এগুলি ছিল অপেক্ষাকৃত বড়—প্রায় ১৫০ সেন্টিমিটার লম্বা মনুষ্যাকৃতি বানর (অস্ত্রালো-পিথেকাস, প্লেসিয়ান্থ্রোপাস, পারান্থোপাস্ ইত্যাদি)।

এগুলি উন্নত হতে থাকল এবং জাগতিক বিবর্তন ক্রমাগত মানুষের অধিকতর নিকটবর্তী হতে থাকল। পরিশেষে, প্রায় ১০ লক্ষ বছর আগে, পৃথিবীতে আবির্ভূত হল প্রথম বানর-মানুষ, প্রথমে পিতেকান্‌থ্রোপাস, পরে সিনানথ্রোপাস।

পিতেকান্‌থ্রোপাস্‌-দের হাড়ের অবশেষ প্রথম পাওয়া গিয়েছিল ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে, ইয়াভা দ্বীপে। যে স্তরগুলির ভিতরে পাওয়া গিয়েছিল ভূতাত্ত্বিকেরা তার বয়স ১০০০০০০ বছর বলে নির্ণয় করেছিলেন। গ্রীক শব্দ পিতেকানথ্রোপ-এর অর্থ হচ্ছে বানর-মানুষ। বানর এবং মানুষের মাঝখানকার এই ধরণের অন্তর্বর্তী একটি রূপের অস্তিত্ব ডারউইন অনুমান করেছিলেন এবং এই বৈজ্ঞানিকের ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি এইভাবে প্রতিষ্ঠিত হল। কোমর থেকে হাঁটু অবধি দৈর্ঘ্য বিচার করে দেখা যায়, এগুলি বেশ বড় প্রাণী ছিল, লম্বায় ছিল প্রায় ১৭০ সেন্টিমিটার। পিতেকানথ্রোপাস-রা পাথর থেকে অত্যন্ত অমার্জিত অস্ত্র বানাতে পারত, একথা মনে করার সঙ্গত ভিত্তি আছে, কেন না সেই একই দ্বীপে, মোটামুটি একই সময়কার স্তরে এই রকম অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু তারা আগুন জ্বালাতে পারত কিনা বা আগুনের ব্যবহার জানত কিনা, একথা এখন অজানা রয়ে গেছে।

চীনের বৈজ্ঞানিক পেই ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে পিকিং-এর কাছে গুহায় মানুষের পূর্বপুরুষদের বিষয়ে আর একটি লক্ষণীয় আবিষ্কার করেন। সেখানে পর পর কয়েক বছর ধরে পরিকল্পিতভাবে খননকার্য চালান হয়েছিল এবং বিভিন্ন বয়স

এবং লিঙ্গের বানর-মানুষের হাড় পাওয়া গিয়েছিল। এদের নাম দেওয়া হয়েছিল সিনানথ্রোপাস্ অর্থাৎ চৈনিক বানর-মানুষ (২৫নং চিত্র দেখুন)। সিনানথ্রোপাস-দের সঙ্গে ছাই, অস্ত্রশস্ত্র এবং জীবজন্তুর হাড়ের একটি পুরু স্তর পাওয়া গিয়েছিল। জীবজন্তুগুলিকে সিনানথ্রোপাস্-রা শিকার করেছিল। সিনান্থ্রোপাস্-দের দৈর্ঘ্য পিতেকান্থ্রোপাস-দের চেয়ে একটু কম। পুরুষেরা ১৬৩ আর মেয়েরা প্রায় ১৫২ সেন্টিমিটার লম্বা ছিল। পিতেকানথ্রোপাসদের তুলনায় সিনান্থ্রোপাস্‌রা ইতিমধ্যেই ক্রমবিকাশের সম্মুখের স্তরে চলে এসেছে। এদের ঘিলুর ঘনমান ১১০০—১২০০ ঘন-সেন্টিমিটারে পৌঁছেছিল। তখন পিতেকান্থ্রোপাস্‌দের ঘিলুর ঘনমান ১০০০ ঘন-সেন্টিমিটারের বেশি হয়নি। এই সঙ্গে মনে আনা যাক যে মানুষের ঘিলুর ঘনমান প্রায় ১৫০০ ঘন-সেন্টিমিটার। সমকালীন মানুষ আর সিনান্থ্রোপাস্‌দের মধ্যে ঢের পার্থক্য ছিল। কিন্তু তবু এরা মানুষই। এরা আগুন ব্যবহার করত এবং মানুষের ইতিহাসে এটাই হল সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব। সিনান্থ্রোপাস্‌দের এবং পিতেকান্-



চিত্র ২৫॥ কোয়ার্টারনারি পর্যায়ের গোড়ার দিকের বানর-মানুষ—সিনান্থ্রোপাস্।

থোপাসদের অবশেষ-প্রাপ্তি মানুষের জন্ম বিষয়ে বস্তুবাদী শিক্ষার এক বিরাট জয়।

পৃথিবীতে বানর মানুষের আবির্ভাবের সময় থেকে, অর্থাৎ প্রায় ১০০০০০০ বছর আগে থেকে মনুষ্যসমাজের প্রাচীনতম ইতিহাসের শুরু। এই ঘটনার তাৎপর্য চিহ্নিত করার জন্যে বহু বৈজ্ঞানিক পৃথিবীর ইতিহাসের এই পর্যায়কে এ্যানথ্রোপো-জেনাস্ বা এ্যানথ্রোপোজেনিক বলেন, যার অর্থ পৃথিবীতে মানুষের জন্ম বা আবির্ভাবের কাল।

হাজার হাজার বছর অতীত হল, ৫০০০০০ বছর আগে পৃথিবীতে বানর-মানুষ থেকে এক নতুন প্রাণীর উদ্ভব হল। বর্তমান কালের মানুষ এবং বানর মানুষের মাঝখানকার শেষ যোগসূত্র এরাই। এই নতুন প্রাণীর নাম দেওয়া হয়েছে নিয়ান্‌দের্থালীয় (জার্মানীর নিয়ান্‌দের্থাল্ উপত্যকার নামানুসারে। এখানে ১৮৮৬ খৃস্টাব্দে অবশেষ পাওয়া গিয়েছিল) বা প্যালিওএ্যান্‌থ্রোপাস্ যার মানে প্রাচীন, আদিম মানুষ। প্রাথমিক মানুষ লম্বায় ছিল ছোট, উচ্চতা ছিল প্রায় ১৬০ স. ম.। কিন্তু এদের গায়ে জোর ছিল বেশ। নিচু, পেছনে হেলানো কপাল, ঝুলে পড়া ভুরু, তার নীচে ছোট ছোট চোখ ইত্যাদি শুদ্ধ তাদের লম্বাটে মাথা বসানো ছিল খাটো একটি গলার উপর। নাক ছিল থ্যাবড়া, বানরের নাকের মত। আর দাড়িও আমাদের মত লম্বা ছিল না। সমকালীন মানুষের পূর্বপুরুষদের মুখাবয়ব ছিল এই রকম (চিত্র ২৬)।

নিয়ান্‌দের্থালীয়দের চেহারা ছিল ভয়ানক বিশ্রী, শক্ত

পায়ের উপরে খাটো একটি ভারী শরীর চাপানো, পায়ের নলি ছিল ছোট, পায়ের পাতা ছিল ভারি আর চওড়া। সবল হাতের পাতাও ছিল চওড়া, আঙুল ছিল মোটা, ছোট ছোট। এই আঙুল দিয়ে অবশ্য পাথরের অমার্জিত গোঁজ (কুড়ুল) এবং



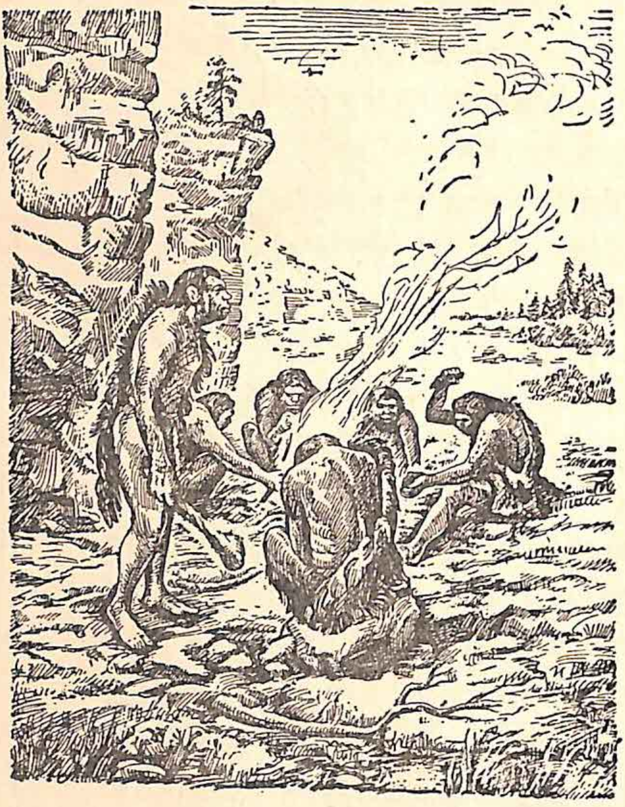
চিত্র ২৬॥ আদিম মানুষ —নিয়ান্দেরথালীয়।

চাঁচুনি তৈরি করা চলত। এই প্রাচীন মল্লবীরদের হাতে মুগুর ছিল আত্মরক্ষা, আক্রমণ এবং শিকারের এক নির্ভর-যোগ্য অস্ত্র।

নিয়ান্দের্থালীয়দের প্রিয় বাসস্থান ছিল নদীর পাড় ও গুহা (চিত্র ২৭)।

এদের এবং এদের নিকটতম পূর্বপুরুষদের বিরাট এক সুবিধে ছিল এই যে এরা খাড়া হয়ে দুপায়ে হাঁটতে পারত, যার ফলে তাদের হাত থাকত খালি। নানান ধরনের শ্রম-সহায়ক জিনিস তৈরি করা যেত হাত দিয়ে, আর এর প্রথম ফল হল শিকারের সম্ভাবনা প্রশস্ত হয়ে যাওয়া। সেই সময়ে ফল এবং খাবার-মত উদ্ভিদ আহরণের সঙ্গে সঙ্গে শিকার ছিল আমাদের পূর্বপুরুষদের জীবিকার প্রধান উৎস।

আদিম মানুষের কঙ্কাল, কঙ্কালের টুকরো এবং তাদের



চিত্র ২৭॥ নিয়ান্‌দেরথালীয়দের গুহা-আবাস।

বাস্তব সংস্কৃতির অবশেষ সোভিয়েত ইউনিয়নে যেমন, বিদেশেও তেমনি পাওয়া গেছে, আমেরিকা আর অষ্ট্রেলিয়া ছাড়া।

প্রায় ৩ লক্ষ বছরব্যাপী নিয়ান্‌দের্থালীয়েরা তাদের পাথর কাটবার আদিম কৌশল উন্নত করেছে। শ্রমের ফলে ক্রমে ক্রমে তাদের বহিরাকৃতি পালটেছে। ক্রমেই তারা আজকালকার

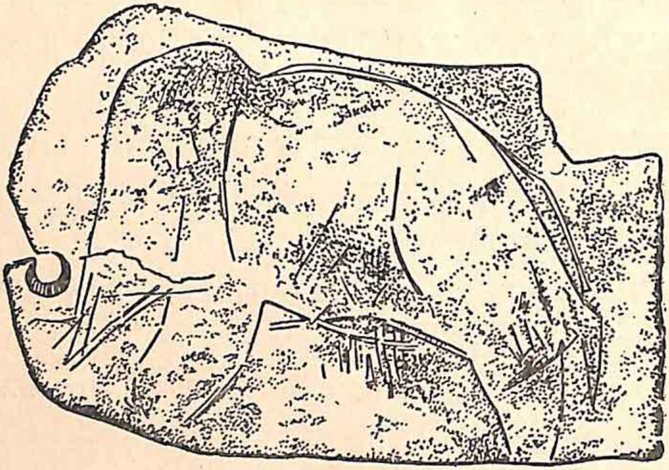
মানুষের মত হয়ে উঠেছে। পৃথিবীতে বিপুল তুষারসম্পাত যখন সবচেয়ে বড় আকারের হয়ে পড়েছে তখন মানুষ জীবনের নতুন অবস্থার সঙ্গে অভ্যস্ত হতে পেরেছিল আর তার মধ্যেই তারা দেখতে একেবারে আজকালকার মত হয়ে গিয়েছিল। এই সময়ে শ্রম এবং শিকারের সহায়ক অস্ত্রের সবচেয়ে মূল্যবান উন্নতি সাধিত হয়েছিল। মানুষ এই সময়ে পাথর থেকে ঘসে ঘসে, কাঠের গোঁজের মত টুকরো না করে বিশেষ-ভাবে বিন্যস্ত পাথরের পাত তৈরি করে তা দিয়ে অস্ত্র বানাতে শিখেছিল। এতে মানুষ ছুরির ফলার মত দেখতে পাথরের টুকরো তৈরি করতে শিখেছিল। সব রকমের জিনিসের জন্যে মানুষ ব্যাপকভাবে হাড় ব্যবহার করতে শিখল। বর্শার ফলা দেখা দিল, দেখা দিল ছেঁদা করবার জিনিস, নিপুণভাবে তৈরি চাঁচনি, ছুরি, হাড় কাটা কাটারি, জামাকাপড় সেলাই করার ফুটোশুদ্ধ হাড়ের ছুঁচ ইত্যাদি।

মনুষ্য সমাজের বিবর্তনের এই স্তরের নাম দেওয়া হয়েছে উচ্চ-জীবাশ্ম বৈজ্ঞানিক স্তর।

সেই সময়কার ধ্বংসাবশেষে কখনো কখনো নানান ধরনের গৃহস্থালীর জিনিসপত্র এবং শিকারের অস্ত্র ছাড়াও, ম্যামথ-এর দাঁত থেকে তৈরি নারীদেহ বা নানান প্রাণীর খোদাই করা চিত্র পাওয়া যায়। এগুলিকে ঐন্দ্রজালিক অনুষ্ঠানে ব্যবহার করা হত।

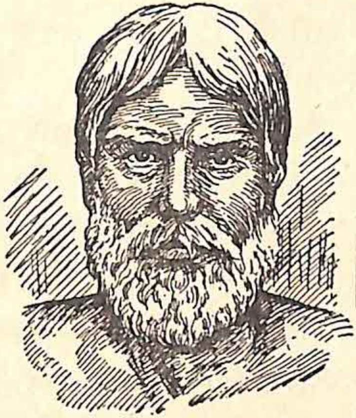
দুষ্প্রবেশ্য গুহাগুলি কখনো কখনো আমাদের পূর্বপুরুষদের পবিত্র স্থান হিসেবে কাজে লাগত। এইসব জায়গায় নানান

রকম ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হত। কতকগুলি গুহার দেওয়ালে এখন পর্যন্ত সাদা এবং কালো রঙে আঁকা ছবি রয়ে গিয়েছে। ছবিগুলিতে বর্শার ফলা দিয়ে বাইসন, ম্যামথ, হরিণ ইত্যাদি চিত্রিত করা হয়েছে (চিত্র ২৮)। সব আঙুল কাটা হাতের পাতার ছবি এবং আমাদের নিকট অপরিচিত ইন্দ্রজালের ছবিও আঁকা আছে।



চিত্র ২৮॥ উচ্চ প্যালিওলিথিক মানুষের হাড়ের উপর উৎকীর্ণ ম্যামথের ছবি।

উচ্চ জীবাশ্ম বৈজ্ঞানিক স্তরের মানুষ হচ্ছে 'নতুন মানুষ', এদের সাধারণত 'যুক্তিবাদী মানুষ' বলা হয়। দৈহিক দিক থেকে সমকালীন মানুষের সঙ্গে এদের কোনো তফাতই ছিল না (চিত্র ২৯)।



চিত্র ২৯ ॥ নিয়ান্‌দেরথালীয়দের সরাসরি বংশধর উচ্চ প্যালিওলিথিক মানুষ।

উচ্চ জীবাশ্ম বৈজ্ঞানিক মানুষ কাদা দিয়ে বাসন-পত্র বানাতে জানত না, তীর ধনুকের ব্যবহারও জানত না, বর্শা ব্যবহার করত। তাদের কোন গৃহপালিত পশু ছিল না এবং কৃষিকাজের বিন্দুবিসর্গও জানত না। আগের মত শিকারই ছিল জীবিকার প্রধান অবলম্বন এবং তারা বেশ সাফল্য অর্জন করেছিল।



চিত্র ৩০ ॥ উচ্চ প্যালিওলিথিক মানুষ ম্যামথের শব কাটছে।

'নতুন মানুষেরা' যাযাবর শিকারী ছিল। বাইসন, গণ্ডার এমন কি ম্যামথ-এর মত বড় বড় প্রাণী পর্যন্ত শিকার করতে পারত। কিন্তু গলন্ত হিমবাহের মধ্যে জমে যাওয়া মরা প্রাণী তারা আগ্রহ করে খেত (চিত্র ৩০)। এর চেয়ে নিরীহ এবং সহজলভ্য প্রাণী, বিশেষ করে হরিণ, আর পাখিদের ভিতর সাদা উইলোপ্ টারমিগান প্রভৃতি তারা বিপুল পরিমাণে নিধন করত। বিভিন্ন প্রাণীর হাজার হাজার হাড় আমরা এদের আবাসস্থল খুঁড়লে পাই। কিন্তু সেখানে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় ম্যামথ এবং বল্গা হরিণের হাড়। এই জন্যে উচ্চ জীবাশ্ম বৈজ্ঞানিক স্তরের মানুষকে প্রায়ই 'ম্যামথ এবং বল্গা হরিণ শিকারী' বলা হয়।

অনেক হাজার বছর অতীত হল এবং বর্তমান মহাযুগের প্রারম্ভে, ১৫ হাজার বছর আগে মানুষ নতুন এক আবিষ্কার করল—তীর ধনুক। এই আবিষ্কার তাদের শিকারের সুবিধা করে দিল, শিকারই তাদের প্রধান অবলম্বন। গণ্ডার আর ম্যামথ বহু আগেই বিলুপ্ত হয়েছে। প্রকাণ্ড হিমবাহের আবরণ দ্রুত গলে গেছে। হিমবাহের দক্ষিণ প্রান্ত লেনিনগ্রাদের কাছে চলে এসেছে। জলবায়ু হয়ে উঠেছে উষ্ণ।

মানুষের ইতিহাসে একটি নতুন যুগ— 'নব্য প্রস্তর' বা নিওলিথ যুগের আবির্ভাব হয়েছে।

একটার পর একটা আবিষ্কার এবং উদ্ঘাটন হতে লাগল। প্রকৃতির উপরে মানুষের কর্তৃত্ব ক্রমেই বেড়ে চলল। ধনুকের আবিষ্কারের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ কিছু কিছু দেশে নেকড়ে

বাঘকে আর কিছু দেশে খ্যাঁকশিয়ালকে পোষ মানাল। এইভাবে গৃহপালিত কুকুরও পেল। এর পরে কাদার এক উল্লেখযোগ্য গুণ আবিষ্কৃত হল। কাদা পোড়ালে শক্ত, জলনিরোধক এবং যথেষ্ট অগ্নিনিরোধক দ্রব্য পাওয়া যায়। রান্না করার জন্যে মাটি দিয়ে হাঁড়িকুড়ি তৈরি করা হতে থাকল। তা ছাড়া পাথর দিয়ে মানুষ আরো নিপুণভাবে নানা জিনিস তৈরি করতে শিখল। শিখল পাথর কুঁদতে এবং পালিশ করতে। কাঠের নৌকো দেখা দিল, সেগুলো গাছের আস্ত আস্ত গুঁড়ি থেকে তৈরি।

শিকার কিন্তু আগের মতই মানুষের জীবিকার প্রধান উপায় হিসেবে রয়ে গেল।

শিকারের সঙ্গে সঙ্গে মৎস্য শিকারের কাজটিও ক্রম-বিকশিত হতে লাগল, আর কোদাল দিয়ে কৃষিকাজ করা হতে থাকল।

প্রস্তর যুগ প্রায় ছ সাত হাজার বছর আগে শেষ হয়ে গেল। মানুষ ধাতুর ব্যবহার শিখল এবং তার থেকে শিকার এবং গৃহস্থালীর জিনিসপত্র তৈরি করতে শিখল।

ধাতুযুগের আবির্ভাব হল। ছুরি, বর্শার ফলা, তীর ইত্যাদি ছিল ধাতুনির্মিত জিনিসের মধ্যে প্রথম। প্রথমে এগুলি বিশুদ্ধ তামা থেকে বানানো হত, পরে ব্রোঞ্জ থেকে (তামা আর দস্তার মিশ্রণ) এবং সব শেষে হতে লাগল লোহা থেকে।

শিকার এবং মৎস্য শিকারের সঙ্গে পশুপালন এবং কৃষি-কাজ যুক্ত হল। কৃষিকাজের সূত্রপাত হয়েছিল। দৃশ্যত,

নিওলিথ যুগের শেষেই প্রকৃতি-নির্মিত বস্তু ব্যবহার করতে করতে সচেতন ভাবে এইসব বস্তুর উন্নতির দিকে মানুষ এগিয়ে গেল।

সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রস্তরযুগের মনুষ্যবসতির আবিষ্কার এবং তার অনুশীলনের কৃতিত্ব আমাদের সোভিয়েত বৈজ্ঞানিক প. প. এফিমেন্‌কো, স. ন. জমিয়াৎনিন, ম. ভ. ভোয়ে-ভোদ্‌স্কি, স. ন. বিবিকভ্‌, প. ই. বোরিস্‌কোভ্‌স্কি, গ. প. সস্‌নোভ্‌স্কি, ও. ন. বাদ্‌য়ের, আ. ন. রোগাচেভ্‌, ম. জ. পানিচ্‌কিনা এবং অন্যান্য বহু বৈজ্ঞানিকের প্রাপ্য।

মাথার খুলি দেখে মুখের চেহারা নির্ণয় করার পদ্ধতি বার করেছেন ম. ম. গেরাসিম্‌। আমাদের হাজার হাজার বছর আগেকার পূর্বপুরুষদের মুখাবয়ব কেমন ছিল তা এখন আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব। এই সমস্যাটিকে সমাধানের জন্যে বিদেশী বৈজ্ঞানিকেরা বহু বছর ধরে চেষ্টা করেও সফল হতে পারেননি এবং সমস্যাটিকে সমাধানের অযোগ্য বলে মনে করেছেন।

* * *

মানুষ হঠাৎ পৃথিবীর ইতিহাস পড়তে শেখেনি, হঠাৎ পৃথিবীর অতীত সম্বন্ধে নির্ভুল, বৈজ্ঞানিক ধারণা তৈরি করতে পারেনি।

মধ্যযুগে, ৪০০-৫০০ বছর আগেও, মানুষ বিশ্বাস করত যে পৃথিবী তিনটি হাতীর পিঠে দাঁড়িয়ে রয়েছে। হাতীগুলো দাঁড়িয়ে রয়েছে এক কচ্ছপের পিঠে, আর কচ্ছপটি সাঁতরাচ্ছে মহাজাগতিক সমুদ্রে।

ম্যামথের হাড়গুলিকে অতিকায় রাজা বা পুণ্যবান ব্যক্তিদের হাড় বলে মনে করা হত। এই জন্যে কতকগুলি গির্জায় ম্যামথের হাড় রেখে দেওয়া হয়েছে। বহুদিন যাবৎ এগুলিকে পুণ্যবানদের অস্থি-অবশেষ বলে মনে করা হয়েছে।

নিজেদের মনগড়া কথাকে বিশ্বাসযোগ্য করার জন্যে পাদ্রীরা বলেছে যে তারা অপার্থিব, আশ্চর্য ঘটনা চাক্ষুষ ঘটতে দেখেছে। এরকম 'প্রত্যক্ষদর্শী'ও পাওয়া গেল। এরা বলল যে পৃথিবীর 'প্রান্তে' পেঁৗছে তারা এমন সব যন্ত্র ব্যবস্থা দেখেছে যা দিয়ে সূর্য চন্দ্র আর তারকাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে।

মধ্যযুগের বৈজ্ঞানিকেরা অজ্ঞানতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন, পৃথিবী সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ধারনার জন্ম দিয়েছেন। অবশ্য এই ধরনের বৈজ্ঞানিক এবং এদের কথায় বিশ্বাসী লোকদের নাস্তিক বলা হত, কারারুদ্ধ করা হত, বহ্ন্যুৎসবে পোড়ানো হত।

মানুষের প্রাচীন আবাসস্থলগুলির খননকার্য অবিসংবাদিত ভাবে সাক্ষ্য দেয় যে আদিম মানুষকে জীবিকার কাঠিন্য, প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ বিপর্যস্ত হতে হয়েছিল। খননকার্যের দ্বারা উদ্ঘাটিত আদিম মানুষের ঘরবাড়িগুলির দিকে—কুড়ে এবং মাটির ঘর, গুহা এবং চালাঘরগুলি, যাদের ভিতর আমাদের পূর্বপুরুষেরা বাস করত,—তাদের দিকে একবার তাকালেই একথা স্পষ্ট বোঝা যায়। তাদের শ্রম এবং শিকারের অস্ত্রগুলির দিকে একবার তাকালেই বোঝা

যায়, হরিণ, ঘোড়া, হরিণী ইত্যাদি মারবার জন্যে তাদের কী পরিমাণ শক্তি ব্যয় করতে হত। গণ্ডার, ম্যামথ ইত্যাদির কথা না হয় বাদই দিলাম, এমন কি গুহাবাসী ভালুক, গুহা-বাসী সিংহ এবং অন্যান্য প্রাণী যে গুলির সঙ্গে মানুষের হামেশা লড়াই করতে হত, সেগুলির কথাও ধরছি না।

পাথর আর হাড়ের অস্ত্র দিয়ে জন্তু জানোয়ারের চামড়া ছাড়াতে, জামা কাপড় সেলাই করতে এবং বাড়িঘর বানাতে কি খাটুনিই না হত।

প্রকৃতির দুর্বোধ্য ভয়াল শক্তির সঙ্গে প্রতিনিয়ত লড়াই চালিয়ে যেতে হত। এসব ব্যাপার থেকেই আদিম মানুষের মনে অতিপ্রাকৃতিক জীবন এবং ঐন্দ্রজালিক অনুষ্ঠানের প্রতি, সবরকম রক্ষাকবচের ঐন্দ্রজালিক শক্তির প্রতি বিশ্বাস জন্মেছিল।

মানুষের কল্পিত কাহিনীর নায়কেরা বনে জঙ্গলে পাহাড় প্রান্তরে বাস করত, বাস করত জলপরী আর জলা ভূত, গেছো ভূত আর বাড়ির ভূত। ক্রমে ক্রমে আত্মায় বিশ্বাস জন্মাল, বিশ্বাস জন্মাল দেহাতীত জীবনে, পাহাড়ের আত্মায়, ঝড়, বিদ্যুৎসম্পাত, সূর্য, চাঁদ, তারা ইত্যাদির দেবত্বে। অবশ্য বিভিন্ন মানুষ দেবতাদের নামকরণ করেছিল বিভিন্ন রকমে। কিন্তু প্রধান সারমর্ম ছিল একই, অতিপ্রাকৃতিক জীবনের অস্তিত্বে বিশ্বাস, যা নাকি মানুষের জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এবং যা মানুষের ক্ষতি ও উপকার করতে পারে। অর্থাৎ তাদের করুণা লাভ করতে হবে, প্রিয় হতে হবে। এর থেকে নানা-

প্রকার অনুষ্ঠান, ঐন্দ্রজালিক এবং পুণ্যকর্ম ইত্যাদির সূচনা হয়েছে।

প্রকৃতি সম্বন্ধে অসত্য, মিথ্যা ধারণার ভিত্তির উপরে এইভাবে আদিম ধর্মবিশ্বাস গড়ে উঠেছিল। এঙ্গেল্‌স্ বলেছেন, সমস্ত ধর্মই হচ্ছে মানুষের মস্তিষ্কে সেইসব বহিঃশক্তির অবাস্তব-কল্পিত প্রতিফলন, যেগুলি তাদের দৈনন্দিন জীবনে আধিপত্য করে—এ প্রতিফলনে পার্থিব শক্তি অপার্থিব রূপ পরিগ্রহ করে।

কখন মানুষের মধ্যে ধর্মের উৎপত্তি হয়েছিল ?

ধর্মরক্ষাকারীগণ মানুষের মধ্যে 'ঐশ্বরিক সূচনাকে' বোঝাবার জন্যে জোর দিয়ে বলে যে ধর্ম মানুষের সহজাত। বলে যে ধর্ম কেবল মানুষেরই বিশেষত্ব। কিন্তু এমন সময়ও ছিল যখন ধর্ম বলে কিছু ছিল না।

সকলেই ভালভাবে জানে যে প্রত্যেক ধর্মের সঙ্গেই ইন্দ্রজাল জড়িত। প্রাচীন মানুষের আবাসস্থল, বিশেষত, সমাধিক্ষেত্র খনন করলে এই ইন্দ্রজালের চিহ্ন উন্মোচিত হয়ে পড়ে। এগুলি দেখে কেবল জীবন এবং শ্রমেরই নয়, ধর্মীয় ধারণারও উৎপত্তি এবং ক্রমবিকাশ বোঝা যায়। ধর্মীয় ধারণার প্রথম অবিসংবাদিত চিত্র আমরা পাই সভ্য-উচ্চ জীবাশ্ম যুগের মানুষের মধ্যে। এই পর্যায়ের মানুষের সমাধিতে কঙ্কালের সঙ্গে শ্রম এবং শিকারের অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া যায়। অস্ত্রশস্ত্রগুলি জীবিতাবস্থায় লোকটির নিজেরই ছিল। মাঝে মাঝে মৃতের পাশে রাখা জীবজন্তুর

হাড়ও দেখতে পাওয়া যায়। এগুলি থেকে বোঝা যায় যে উচ্চ জীবাশ্ম বৈজ্ঞানিক স্তরের মানুষ দেহাতীত জীবনে বিশ্বাসী ছিল, বিশ্বাস করত যে মৃতের, বা আরো সঠিকভাবে তার আত্মার এই অস্ত্রশস্ত্র এবং খাবার লাগবে, লোকটির সেই জগতে শিকার করতে হবে, এবং প্রয়োজনীয় খাবার তাকে দিয়ে দেওয়া দরকার।

অনেক বৈজ্ঞানিক মনে করেন যে ধর্মীয় বিশ্বাসের চিহ্ন মুস্তেরীয় মানুষের অবশেষের মধ্যে পাওয়া সম্ভব। এরা বেঁচে ছিল মধ্য এবং উচ্চ প্যালিওলিথিক যুগের সীমাকালে। কিন্তু এ বিষয়ে কারো সন্দেহ নেই যে নিম্ন প্যালিওলিথের সমস্তটাই মানুষের ইতিহাসের সম্পূর্ণ ধর্মহীনতার কাল, কারণ যদিও বহু দেশে তখনকার প্রচুর ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছে, ধর্মীয় অনুষ্ঠানের বা সমাধির কোন চিহ্ন কোথাও পাওয়া যায়নি।

ধর্মের আবির্ভাবকাল পর্যন্ত, হাজার হাজার বছর যাবৎ পাথরের টুকরো আর মুগুর ছিল মানুষের পক্ষে বিরাট এক সুবিধার জিনিস, যা অন্য কোন প্রাণীর ছিল না। মানুষের শিকারের সুবিধা এতে বেড়ে গিয়েছিল। সচেতন ভাবে নির্মিত এই সরলতম অস্ত্র থাকার ফলে প্রাণী-জগতের অন্য সব প্রতিভূদের থেকে মানুষের (আরো সঠিক ভাবে বললে বানর-মানুষ) এক মৌলিক পার্থক্য তৈরি হয়ে গিয়েছিল। শ্রমের বিবর্তন এবং উন্নতিসাধনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের নিজেরও বিবর্তন হচ্ছিল, প্রকৃতির উপরে

সে ক্রমাগত আধিপত্য বিস্তার করছিল। এইভাবে, শ্রমই মানুষকে সৃষ্ট করেছে, ভগবান করেনি। দেবতা এবং ধর্মকে মানুষই তৈরি করেছে—চতুস্পার্শ্বস্থ প্রকৃতির ভয়াল শক্তিকে ব্যাখ্যা করতে, নিজেকে তার অধীন করতে বা ক্রমবিকাশের প্রাথমিক স্তরে এই শক্তিকে প্রসন্ন করতে, জীবনের সম্ভাবনাকে প্রশস্ততর করতে।

শ্রেণীবিভক্ত সমাজের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যসমাজ যখন অধিপতি এবং দাসে, শোষণকারী এবং শোষিত শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে, তখন প্রধান শ্রেণীর হাতে ধর্ম নির্যাতনের অস্ত্র হয়ে দাঁড়াল। ভবিষ্যৎ দেহাতীত জীবনের আশা নিয়ে মানুষকে অধীনস্থ করা এবং সান্ত্বনা দেওয়া শোষক শ্রেণীর পক্ষে সুবিধাজনক। সুবিধাজনক এই কথা বলে উদ্বুদ্ধ করায় যে চমৎকার চিরন্তন একটি জীবন বর্তমান জীবনের পরেই রয়েছে এবং পার্থিব ক্ষুদ্র একটি জীবনে কর্তৃত্বকারী শ্রেণীকে মনপ্রাণ দিয়ে সেবা করলে সেই চিরন্তন জীবনলাভ সুনিশ্চিত। সমস্ত সমকালীন ধর্মের মূলেই এই রকম একটি প্রতিশ্রুতি রয়েছে। পুঁজিবাদের ভিতরে শ্রমিকদের নির্যাতিত অবস্থাটাও তাদের মনে দেবদেবীর প্রতি বিশ্বাসকে পুষ্ট করে। লেনিন বলেছেন, 'বর্বরেরা যেমন প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে দেবদেবতা, ভূত, অলৌকিক ব্যাপারে বিশ্বাস উৎপাদন করে, তেমনি শক্তিহীন শ্রেণীর সঙ্গে সংগ্রামে, অপরিহার্যরূপে উৎকৃষ্ট একটি মরণাতীত জীবন সম্বন্ধে বিশ্বাসের জন্ম দেয়।' (১)

(১) ভ, ই, লেনিন—রচনাবলী, ১০ খণ্ড ৬৫ পৃষ্ঠা, চতুর্থ মুদ্রণ।

পুঁজিবাদী সমাজে বিজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞান শ্রমিকদের নাগালের বাইরে, শোষণকারী সংখ্যালঘুদের সম্পত্তি হিসাবেই তা পরিগণিত। বিজ্ঞান যাতে জনসাধারণের নাগালে পৌঁছতে পারে তার জন্যে সর্বপ্রথম করণীয় হচ্ছে কর্তৃত্বকারী শ্রেণী, শোষণকারী শ্রেণীকে নিশ্চিহ্ন করা। তাহলে দেবদেবতায় এবং ভূতে বিশ্বাস, সৎ এবং অসৎ আত্মায় বিশ্বাস কল্পকাহিনীর বস্তু হয়ে পড়বে।

আমাদের দেশে মানুষের শোষণ চিরকালের জন্যে বিলুপ্ত হয়েছে। বিজ্ঞান এবং তার সমস্ত অবদান শ্রমশীল জনসাধারণের নাগালের ভিতরে। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিশাল জনসাধারণ অলৌকিক, অতিপ্রাকৃতিক শক্তিতে আর বিশ্বাস করে না।

জীবনের সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থায় গভীর পরিবর্তন, শোষকশ্রেণীর বিলোপসাধন, সোভিয়েত ইউনিয়নে সোশ্যালিজমের জয় ইত্যাদির ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নের জনসাধারণের অধিকাংশ বহুকাল পূর্বেই ধর্মীয় ধারণা থেকে মুক্ত হয়েছে। শ্রমিকদের জ্ঞান অপরিমেয়ভাবে বেড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে একথাও উল্লেখ করা উচিত যে এমন সব ভদ্রলোক এখনো আছেন যাঁরা দেশের কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেও, স্বদেশের কাছে নাগরিকত্বের ঋণ পরিশোধ করেও, এখনো ধর্মীয় বিশ্বাসে বিশ্বাসী।

ধর্মবিশ্বাসীদের ভিতরে ধৈর্যসহকারে ব্যাপকভাবে বৈজ্ঞানিক নাস্তিক্যবাদী প্রচার চালালে তাদের পুরোপুরি ধর্মবিশ্বাসমুক্ত করা যায়।

ধর্মীয় অন্ধ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে বর্তমানে বৈজ্ঞানিক, বস্তুবাদী বিশ্বদর্শনের সঙ্গে অবৈজ্ঞানিক ধর্মীয় বিশ্বদর্শনের ভাবগত সংগ্রাম হিসেবে দেখা দরকার।

সোভিয়েত ইউনিয়নের জনসাধারণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান যত ব্যাপকভাবে প্রসারলাভ করবে, শ্রমিকশ্রেণী যত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অধিকারী হবে, বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাসকে ততই পরাস্ত করা যাবে, কারণ ধর্ম বিজ্ঞানের বিপরীত শক্তি ছাড়া আর কিছু নয়।

মানুষের সঞ্চিত সমস্ত জ্ঞানভাণ্ডার সোভিয়েত মানুষকে অধিকার করতেই হবে।

উপসংহার

পৃথিবীর ইতিহাস পড়ার দরকার কী

পৃথিবীর ইতিহাসের লক্ষ লক্ষ বছর আমরা অত্যন্ত দ্রুত পার হয়ে এলাম। দেখলাম, অধুনা নির্বাপিত জীবনের স্ফুলিঙ্গ একদা বহু শতাব্দী পূর্বে কী ভাবে জ্বলত। এই জীবনের ক্রমিক বিকাশকে আমরা অনুসরণ করে এসেছি, তার প্রথম আভাসের থেকে—ক্ষুদ্র জেলির বিন্দুর মত যেসব সজীব পদার্থ আদিম সমুদ্রে জন্মাত তাদের থেকে সমকালীন মানুষ পর্যন্ত।

আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছি যে জলভাগ এবং স্থলভাগ, নদী এবং হ্রদ, আমরা এখন যেখানে দেখছি সেখানে সব সময় তা ছিল না।

জলবায়ুও সবসময় এখনকার মত ছিল না। দেখা গেছে যে এমন সময়ও ছিল যখন উক্রাইনের বর্তমানকালীন সমভূমিতে বানর বাস করত, তারপরে দেখা দিয়েছিল বিপুল তুষারসম্পাত এবং ইউরোপ ও এশিয়ার ব্যাপক অঞ্চল বরফে ঢেকে দিয়েছিল।

এমন কি এই সময়ে ক্রিমিয়াতে মেরুঅঞ্চলের জীবজন্তু বাস করত, বাস করত মেরুশৃগাল, বলগা হরিণ, মেরুদেশীয় স্কাইলার্ক এবং তুন্দ্রা অঞ্চলের উইলোপটার্‌মিগান্‌।

আমরা দেখেছি পরিবর্তনশীল জলবায়ুর এবং জীবনের অন্যান্য অবস্থার ক্রিয়ায় কীভাবে প্রাণী এবং উদ্ভিদ পালটে গেছে, নতুন নতুন রূপ লাভ করেছে। প্রাকৃতিক জগতে এই পরিবর্তন এত ধীর গতিতে হয় যে আমরা তা লক্ষ্য করতে পারি না।

সমস্ত পৃথিবীর বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বৈজ্ঞানিকদের বহুবৎসরব্যাপী একনিষ্ঠ গবেষণার ফলে পৃথিবীর ইতিহাস সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া গিয়েছে।

এই বিপুল কর্মসমষ্টির দ্বারা একটি অত্যন্ত মূল্যবান সিদ্ধান্ত করা গেছে। তা হচ্ছে এই যে, পৃথিবীতে আবির্ভূত জীবন কখনো থেমে থাকেনি বরং লক্ষ লক্ষ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে ক্রমবিকশিত হয়েছে এবং এখনও ক্রমবিকশিত হচ্ছে।

সরলতম সজীব পদার্থ থেকে জটিল পদার্থের দিকে, নিম্নের

থেকে উচ্চের দিকে এই ক্রমবিকাশ। সময়ের প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে সরলগঠন সজীবপদার্থ থেকে, পরিবর্তনশীল বহিঃপ্রভাবের (জলবায়ু, জল এবং স্থল) ক্রিয়ায় জটিল থেকে জটিলতরের দিকে এই ক্রমবিকাশ। এইভাবে আমাদের উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের বিকাশ ঘটেছে, আমাদের নিজেদেরও বিকাশ হয়েছে।

আমরা জানতে পেরেছি, কখন আমাদের পূর্বপুরুষ আদিম মানব দেখা দিয়েছিল, কী করে তারা ক্রমে ক্রমে পৃথিবীর অধিকর্তা হয়ে উঠল।

কেউ কেউ প্রশ্ন করতে পারে, কেন এসব জানা ?

প্রত্যেকটি সংস্কৃতি সম্পন্ন মানুষেরই এসব জ্ঞান থাকা দরকার। পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব ও ক্রমবিকাশের ইতিহাসবিষয়ক এই জ্ঞানের ভিত্তি নির্ভুল বৈজ্ঞানিক তথ্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত। এ জ্ঞান থাকলে ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সফল সংগ্রাম করা যায়। ধর্মীয় কুসংস্কারকে বিদেশে ক্ষতিকর এবং মিথ্যা সব মতবাদের 'প্রমাণ' হিসেবে ব্যবহার করা হয়। যেমন, আদিম কাল থেকেই নাকি উন্নত জাতিগুলি 'অবনত' জাতিগুলির উপরে কর্তৃত্ব করার জন্যে সৃষ্ট হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি। এসব মতবাদ আমাদের দেশে অপরিচিত।

অতীত পৃথিবীবিষয়ক জ্ঞান কেবল আমাদের জ্ঞান-পিপাসাকেই নিবৃত্ত করে না, উপরন্তু আমাদের এক ব্যবহারিক শক্তি প্রদান করে। সকলেই ভালভাবে জানে যে পৃথিবীর বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন মূল্যবান খনিজ দ্রব্য—পাথুরে কয়লা, পেট্রোলিয়াম, ধাতব পদার্থ, সোনা ইত্যাদি সঞ্চিত আছে। পৃথিবীর স্তর-

গুলির গঠনের ইতিহাস অধ্যয়ন করে আমরা এগুলির ভিতর-কার খনিজদ্রব্যের জন্ম এবং বিন্যাসের নিয়মগুলি জানতে পারি। আর এতে এগুলিকে খুঁজে পাওয়া সহজসাধ্য হয়ে যায়। যেমন, সবাই জানে যে সোনা, প্লাটিনাম এবং হীরকের খনি কেবল নদীর অবক্ষেপের ভিতরেই সাধারণত থাকে। অবশ্য নদীগুলিকে আমরা এখন যেখানে দেখছি সেখানে ওগুলি সবসময় ছিল না। সুতরাং যে অঞ্চলে সোনা আছে, সেই অঞ্চলের নদীগুলির বিন্যাসের ইতিহাস অধ্যয়ন করে আমরা নতুন নতুন খনির সন্ধান পেতে পারি। তা নাহলে খনি-আবিষ্কার কেবল ঘটনাক্রমের উপরই নির্ভর করত।

অতীত পৃথিবী সম্বন্ধে নির্ভুল জ্ঞান থাকায় ভূতাত্ত্বিকগণ আগেই জানতে পারেন যে কোথায় কত গভীরতায় পেট্রোলিয়াম, পাথুরে কয়লা এবং অন্যান্য বহু খনিজ দ্রব্য খুঁজতে হবে।

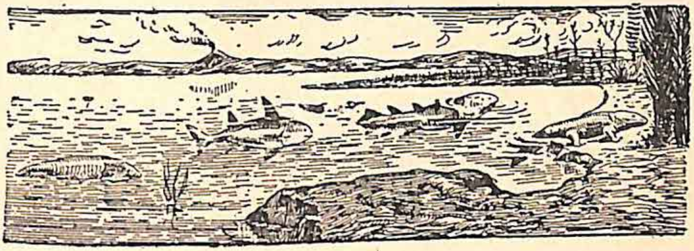
এইভাবে, অতীত পৃথিবীর বিষয় অধ্যয়ন কেবল আমাদের জ্ঞানপিপাসাকে নিবারণ করে না, উপরন্তু খনিজদ্রব্য খুঁজে পেতে এবং ব্যবহার করতে সাহায্য করে।



মাছ থেকে মানুষ

মহাযুগ ঃ প্যালিওজয়িক

পর্যায় ঃ সিলুরিয়ান (১২ কোটি বছর) দেভোনিয়ান (৫.৫ কোটি বছর)



অস্ত্রাস্পিস্ আকেতোজয়েড্ য়ুস্তেনোপ্‌তেরন্ ইক্‌তিওস্তেগা

প্যালিওজয়িক

কার্বনিফেরাস (৫.৫ কোটি বছর) পার্মিয়ান (২·৫ কোটি)

মেসোজয়িক

ত্রিয়াসিক (৩ কোটি)



দিপ্লোভাটিব্রন্ সেমুরিয়া কাপ্তোরিনুস্ সাইনোগনেথাস্

মেসোজয়িক

জুরাসিক (২·৫ কোটি) ক্রেটেসাস্ (৭ কোটি)



ট্রাইনাক্সোদন্ ইক্‌টিদোসেরাস্ এ্যাম্ফিথেরিয়াম্ স্যালাম্বব্‌দালেস্তেস্

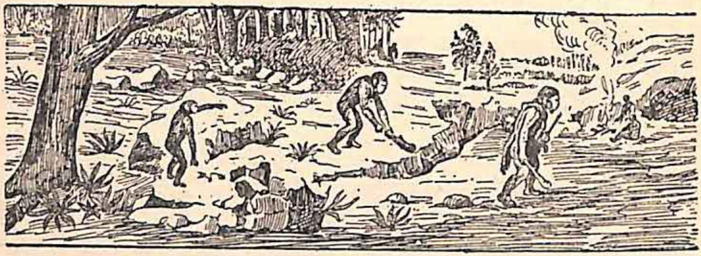
কাইনোজয়িক

টারসিয়ারি (৫·৯ কোটি বছর)

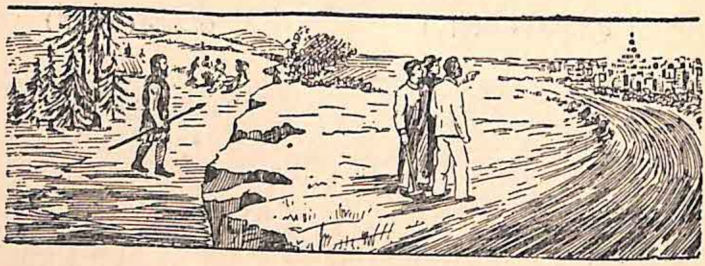


তপাহয়া　লেমুর　প্যারাপিথেকাস্　প্রপ্লিওথেকাস্　দ্রিওপিথেকাস

কোয়াটারনারি বা এ্যান্থ্রোপোজেনাস্ (১০ লক্ষ বছর)



অস্ত্রালোপিথেকাস　পিতেকান্থ্রোপাস　নিয়ান্দার্থালীয়



ক্রোমানিওনীয়　সমকালীন মানুষ

পৃথিবীতে জীবনের ক্রমবিকাশ

মহাযুগের নাম	স্থায়িত্বকাল কোটি বছরে	পৃথিবীতে জীবনের ক্রমবিকাশের বৈশিষ্ট্য	পর্যায়ের নাম	পর্যায়ের স্থায়িত্বকাল কোটি বছরে	পর্যায়ের প্রান্ত থেকে আমাদের কাল পর্যন্ত অতিবাহিত সময় কোটি বছরে	সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী
আর্কেইক	৯৮	প্রাচীনতম মেরুদণ্ডহীন প্রাণীর আবির্ভাব		—	—	সাগরে জীবন জন্মলাভ করেছে।
				—	২১০	প্রথম সামুদ্রিক শৈবাল আবির্ভূত হয়েছে।
প্রোতেরোজয়িক	৬০	জলে এবং স্থলে জীবনের সূচনা		—	—	মেরুদণ্ডহীন প্রাণী, সামুদ্রিক শৈবাল, ত্রিলেবিত এবং বিছে কাঁকড়ার উদ্ভব।
প্যালিওজয়িক	৩৩.৫	মেরুদণ্ডহীন প্রাণীর আধিপত্য এবং মেরুদণ্ডী প্রাণীর আবির্ভাব	কেম্ব্রিয়ান্	৮	৫২	বিছে কাঁকড়ার আধিপত্য। প্রথম জেলিফিসের আবির্ভাব।
			সিলুরিয়ান্	১২	৪৪	স্থলচর বিছে এবং স্থলজ উদ্ভিদের উদ্ভব।
			দেভোনিয়ান্	৫.৫	৩২	মাছের বিশালাকৃতি প্রাপ্তি এবং আধিপত্য। প্রথম কীটপতঙ্গ।
			কার্বনিফেরাস্	৫.৫	২৬.৫	উদ্ভিদ এবং কীটপতঙ্গের বিকাশ, সরীসৃপের আবির্ভাব।
			পার্মিয়ান্	২ ৫	২১	সরীসৃপের বৃহৎ আকৃতি এবং বিচিত্র রূপ প্রাপ্তি, এদের ক্রমবিকাশ।

মহাযুগের নাম	স্থায়িত্বকাল কোটি বছরে	পৃথিবীতে জীবনের ক্রমবিকাশের বৈশিষ্ট্য	পর্যায়ের নাম	পর্যায়ের স্থায়িত্বকাল কোটি বছরে	পর্যায়ের প্রারম্ভ থেকে আমাদের কাল পর্যন্ত অতিবাহিত সময় কোটি বছরে	সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী
মেসোজয়িক	১২·৫	সরীসৃপের আধিপত্য	ত্রিয়াসিক	৩	১৮·৫	শ্বাপদ এবং স্তন্যপায়ীদের মিশ্রিত চিহ্নবিশিষ্ট স্থলচর প্রাণী। আদিম স্তন্যপায়ী। ফার্ণের প্রাচুর্য।
			জুরাসিক	২·৫	১৫·৫	জল স্থল এবং বায়ু সরীসৃপ অধিকৃত। পাখির আবির্ভাব।
			ক্রেটেসাস্	৭	১৩	প্রথম বৃক্ষের বিকাশ। পিরিয়ডের শেষ দিকে সরীসৃপ লোপ পেতে শুরু করেছে। প্লাসেণ্টা স্তন্যপায়ীদের সমস্ত মৌলিক প্রকারের জীবের উদ্ভব।
কাইনোজয়িক	৬	স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং মানুষের আধিপত্য	টারসিয়ারি	৫·৯	৫	স্তন্যপায়ীদের আধিপত্য এবং বিকাশ। মানুষের নিকটতম পূর্বপুরুষদের আবির্ভাব। পিরিয়ডের প্রারম্ভে গুল্মের উদ্ভব।
			কোয়ার্টারনারি	৫·৯	·০৫—·১	মানুষের আবির্ভাব। স্থলে তাদের আধিপত্য বিস্তার।